নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভক্তসাধিকা মীরাবাঈ ও তাঁর বঁধূয়া	৪
পিতৃপক্ষ উমা এবং	২৭
দ্বিতীয় পর্ব	৩১
তৃতীয় পর্ব	৩৬
চতুর্থ পর্ব	৪৫
পঞ্চম পর্ব	৫১
ষষ্ঠ ও অন্তিম পর্ব	৫৭

॥ভক্তসাধিকা মীরাবাঈ ও তাঁর বঁধূয়া॥

মীরাবাঈ বলতে ভেসে ওঠে স্মৃতিপটে একটা ছবি একহাতে তাম্বুরা আরেকহাতে করতাল নিয়ে গাইছেন এক দিব্যভাবে বিভোর সাধিকা নারীমূর্তি নিচের ভজনটি :

পগ ঘুংরু বাঁধ মীরা নাচি রে,
ম্যায় তো নারায়ণ কি আপহি হো গয়ি দাসী রে॥
লোগ কহে মীরা ভই বাবরি ন্যাত কহৈ কুলনাশী রে।
বিষ কা পেয়ালা রাণাজী ভেজা পীবত মীরা হাঁসি রে।
মীরা কে প্রভূ গিরিধারী নাগর সহজ মিলে
অবিনাশী রে।

উপরের পদটি রচিত ভারতের ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত ছিলেন যে মীরাবাঈ, তাঁর দ্বারা। রাজস্থানের রাজপুত রমণী ছিলেন। তার উপলব্ধিতে হিন্দুধর্মের ভক্তিবাদ এবং ইসলামের সুফিবাদ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ভালোবাসার মাধ্যমে ভগবানের উপাসনা করাই ছিল ভক্তিসাধিকা মীরাবাঈয়ের সাধনার প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য। রামানুজ , রামানন্দ , গুরু নানক , কবীর , চৈতন্যদেব , নামদেব প্রমুখরা ভক্তিবাদের যে পরম বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন , তারই। ফলশ্রুতি মীরাবাঈ।

১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে রাজস্থানের উষর মরুপ্রান্তর বেষ্টিত কুড়কী নামক গ্রামে মীরাবাঈয়ের জন্ম হয়। তিনি রাঠোর বংশে জন্মেছিলেন। তার পিতা রত্নসিংহ ছিলেন মেড়তার অধিপতি রাও দুদাজীর চতুর্থ পুত্র। কুড়কী অঞ্চলের বারোখানা গ্রামের জায়গীর উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে তিনি কুড়কীতে গড় স্থাপন করেন। মীরাবাঈ তার একমাত্র কন্যা। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল কিন্তু তাঁর ভজন লেখার সময় নিজেই সেই নাম পাল্টে লেখেন " মিহিরা" "মীরা।" মীরাবাঈয়ের শৈশব জীবনে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে যায়।

শৈশবে যখন মীরাবাঈয়ের তিনবছর বয়স তখন এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী এক রাত্রের জন্য আশ্রয় নেন মেরতার রাজপ্রাসাদে। সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে ছিল তাঁর আরাধ্য দেবতা গিরিধারী গোপাল যাঁকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে পুজো করতেন। মীরাবাঈ ওই কৃষ্ণমূর্তি দেখে মূর্তির প্রতি প্রবল আকৃষ্ট হন এবং ওই মুর্তি নিজের অধিকারে নেওয়ার জন্য বায়না জুড়ে দেন। তাঁর বাবা চিন্তিত ছিলেন ওই কৃষ্ণমূর্তির সঠিক পরিচর্যার বিষয়ে। কিন্তু মেয়ের বায়না কান্নাকাটিতে রূপান্তরিত হলে তিনি আর নিষেধাজ্ঞা ধরে রাখতে পারলেন না। এদিকে সন্ন্যাসীও তাঁর আরাধ্য দেবতাকে ছাড়তে চান না।

অবশেষে গিরিধারী গোপাল রাত্রে সন্ন্যাসীকে স্বপ্নাদেশ মীরার কাছে থাকার অভিলাষ ব্যক্ত করলে পরদিন সন্ন্যাসী সজল চোখে কৃষ্ণমুর্তিটি মীরাকে অর্পণ করে চলে যান। সেই থেকে জীবনের শেষ দিন অবধি ওই কৃষ্ণমুর্তিটি ছিল মীরার সর্বক্ষণের সঙ্গী। যতদিন ছোট ছিলেন তিনি, কৃষ্ণ ছিলেন তাঁর খেলার সাথী। ওই মূর্তির সাথে গল্প করতেন, খেলতেন।

রাজস্থানের পালির পাথুরে রাস্তা দিয়ে বাদ্যি বাজিয়ে চলেছে বিয়ের শোভাযাত্রা। প্রাসাদের জানালা দিয়ে তা দেখে আর চোখের পলক পড়ে না ছোট্ট মীরার। এক দৌড়ে মায়ের কাছে গিয়ে বালিকার আব্দার, আমার বর কই মা?

সাত বছরের মেয়ের কথা শুনে কী উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না রানি বীরকুমারী। হাত ধরে নিয়ে গেলেন গৃহদেবতা গিরিধারীলালের মূর্তির সামনে। বললেন, এই তো তোমার বর।

এরপর থেকে কী যে হল মীরার সাত বছরের রাজ!!!কুমারী মীরা, গিরিধারী ছাড়া কিছুই বোঝে না। তার জগৎ জুড়ে শুধুই শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষত্রিয় রাজপুতকন্যার এই আচরণে বিস্মিত প্রাসাদের সবাই। কারণ মীরা যে সে পরিবারের মেয়ে নয়। স্বয়ং রতন সিং তার বাবা। রাঠোর বংশের মেরতাশাসক কুরকি গ্রামের রাও দুদার - ছোট ছেলে রতন সিং। রাও দুদা আবার রাও যোধার ছেলে। এই রাও যোধা প্রতিষ্ঠা করেন যোধপুর শহরের। সেই রাও যোধার প্রপৌত্রী হয়ে মীরা কি না ভেসে গেলেন ভক্তিসাগরে ক্ষত্রিয় বংশের মেয়ে !!কৃষ্ণপ্রেমে - : হয়ে যেটা বেশ বেমানান। অথচ মীরা গাইছেন

মীরার ভজন:

প্রীত করনা চাহি
প্রেম লাগানা চাহি
ভজন করনা চাহি
সাধনা করনা চাহি রে মানুয়া
সাধন করনা চাহি।
রসসি পূজন সে হরি মিলে তো
ম্যায় পুজু তুলসী ঝাড়
পাথথার পূজন সে হরি মিলে তো
ম্যায় পুজু পাহাড়।
দুধ পীনে সে হরি মিলে

বহুত গজরালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম সে
নাহি মিলে নন্দলালা।

তাঁর মা তাঁর এই ধর্মভাবের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি অকালেই মারা যান। মায়ের কাছে কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে পরিচয় হলেও মীরা বেশিদিন মাতৃস্নেহ পাননি। তাঁর বালিকা বয়সেই সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান বীরদেবী। রাজকুমারী মীরা বড় হন ঠাকুরদা রাও দুদা এবং জেঠু রাও ভীরাম দেবের অভিভাবকত্বে।

রাও দুদাজী ছিলেন ভক্তিমান পুরুষ। প্রাসাদের কাছে তিনি চতুর্ভুজজীর একটি সুরম্য মন্দির তৈরি করেছিলেন। সেখানে সাধু সন্ন্যাসীরা প্রায়ই এসে ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতেন। ইতিমধ্যে মীরা এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর কাছ থেকে গিরিধারির বিগ্রহ উপহার পেয়েছেন বা নিয়েছেন। সবসময় তিনি এই বিগ্রহের সাথেই সময় কাটান। তার সেবা আর পূজার মধ্যে দিয়েই দিনরাত অতিক্রান্ত হয়ে যায়। প্রিয় গোপালকে নিজের লেখা গান গেয়ে শোনান মীরা। কিশোরী বয়স থেকেই তার মনের ভেতর কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাকুলতা জেগেছিল। একটি পর একটি গান লিখে তাতে সুর সংযোজনা করতে থাকেন। একদিন গানের মাধ্যমে অন্তঃপুরবাসিনী আত্মীয়দের কাছে নিজের মনের বাসনা প্রকাশ করলেন, “স্বপ্নে জগদীশের সঙ্গে হয়েছে আমার মালাবদল। বিয়ের সময় সমস্ত তনুবাহারে আমি মেখেছি হলুদ। রাজপ্রাসাদে আমার প্রিয় ভগবান স্বয়ং এসেছিলেন। স্বপ্নে দেখছি, মনোহর তোরণ তৈরি হয়েছে। এসেছেন আমার পরাণপ্রিয়। ভাবেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিজেকে এই" সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করলেন । রাজেশ্বর্য তাঁকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করতে পারল না । জন্মের সাথে মীরা যেন : নিয়ে এসেছেন কৃষ্ণবিরহের জ্বালা যা ফুটে ওঠে তাঁর গানে

কো বিরাহিনী কো কো দুখ জানাই হো,
মীরা কে পতি আপ রামাইয়া, দুজা নেহিন কোই ছানাই হো,
যা ঘট বিরহ সোই লাখ হৈ, কয় কোই হরি জন মানাই হো
রোগী অন্তর ভাইধ বসত হৈ, ভাইধ হী ওখাদ জানাই হো .
বিরাহ কাদ উড়ি আন্দার মানহি, হরি বিন সুখ কানাই হো .
দুগ্ধা আরত ফিরায় দুখারি, সুরাত বাসী সুত মানাই হো .
চাত্য সভান্তি বুঁদ মন মনহি, পিভ . পিভ উকাটানাই হো-
সব জগ কুদো কন্টাক দুনিয়া, দারাদ না কোই পিছনায় হো,
মীরা কে পতি আপ রামাইয়া, দুজা নেহিন কোই ছানাই হো।

১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে, ১৮ বছর বয়সে মীরার বিয়ে হয় মেবারের রাজা রাণা সঙ্ঘের ছেলে ভোজরাজের সঙ্গে। গিরিধারীর মূর্তি সঙ্গে নিয়ে মীরা মেরতা থেকে পা রাখেন চিতোরের কেল্লায়। সঙ্গে ছিলেন বাল্যবন্ধু মিথুলা। তিনি শেষ দিন পর্যন্ত মীরার ছায়াসঙ্গী ছিলেন।

যোদ্ধা পরিবারের সদস্য হয়ে মীরা উল্লেখ করেন যে তিনি প্রকৃতই শ্রীকৃষ্ণের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। ফলে, শ্বশুরবাড়ীর লোকজন তার ঈশ্বর ভক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু মীরার বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। তিনি হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের আসনে কাউকে বসাতে পারেননি। রাজি হননি চিতোর রাজবংশের দেবতা তুলজা ভবানী বা ভীমা ভবানীর বা দুর্গার পুজো করতে, তাঁর পূজাতে বলি দেওয়া পশুর মাংস গ্রহন করতে প্রসাদ হিসেবে। এই নিয়ে অশান্তি। কিন্তু শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও মীরা অটল থাকেন কৃষ্ণপ্রেমে।

BANGL

পায়োজি মায়নে শ্যামরাম রতন ধন/পায়ো
জনম জনম কী পুঁজি পায়ী,
জগ মে সভি খোভাও,
পায়োজি ম্যায়নে শ্যামরাম রতন ধন পায়ো/
খর্চ না লাগে কোই চোর না লুটে,
দিন দিন হোত সভাও,
পায়োজি ম্যায়নে শ্যামরাম রতন ধন পায়ো/
সতকি নাও খেবাতিয়া সৎ গুরু,
করি কৃপা আপনায়ো,
পায়োজি ম্যায়নে শ্যামরাম রতন ধন পায়ো/
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর,
হর্ষি হর্ষি যশ গায়ো,
পায়োজি ম্যায়নে শ্যামরাম রতন ধন পায়ো।/

মীরার ননদ উদাবাই তার ভাই রানা ভোজকে জানিয়েছিলেন যে মীরা কারো সাথে গোপন প্রেমে পড়েছেন, তিনি মন্দিরে মীরাকে তার প্রেমিকের সাথে কথা বলতে দেখেছেন এবং তিনি তাকে সেই ব্যক্তিদের দেখাবেন যদি সে তার সাথে এক রাতে আসে। মহিলারা আরও মজা পেয়েছিলেন যে মীরাবাই তার আচরণের দ্বারা চিতোরের রানা পরিবারের সুনামকে দারুণভাবে ক্ষুন্ন করেছিলেন। ক্ষুব্ধ রানা হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে মীরার দিকে ছুটে গেলেন, কিন্তু ভাগ্যিস মীরা তার কৃষ্ণ মন্দিরে চলে গেছেন। রানার এক বিচক্ষণ আত্মীয় তাকে পরামর্শ দিল, ‘রানা আপনার তাড়াহুড়ো আচরণ এবং পরিণতির জন্য আপনি চিরতরে অনুতপ্ত হবেন। ! অভিযোগটি সাবধানে তদন্ত করুন এবং আপনি সত্য খুঁজে পাবেন। মীরাবাই প্রভুর একজন মহান ভক্ত।

আপনি কেন তার প্রণয় চেয়েছিলেন মনে রাখবেন। নিছক হিংসার বশবর্তী হয়ে মহিলারা হয়তো মীরাবাইয়ের বিরুদ্ধে কলঙ্ক রটনা করেছে আপনাকে প্ররোচিত করতে এবং তার জীবনকে নষ্ট করতে।' রানা শান্ত হলেন এবং তার বোনকে সাথে নিয়ে গেলেন, যিনি তাকে গভীর রাতে মন্দিরে নিয়ে যান। রানা দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ছুটে গেলেন এবং দেখতে পেলেন মীরা একাই তার উচ্ছ্বসিত মেজাজে কথা বলছেন এবং মূর্তির সাথে গান গাইছেন। রানা চিৎকার করে মীরাকে বলল, 'মীরা, তোমার প্রেমিককে দেখাও তুমি এখন কার সঙ্গে কথা বলছ'? মীরা উত্তর দিল, 'সেখানে বসে আছেন তিনিননীচোরা যিনি আমার হৃদয় চুরি করেছেন-আমার প্রভু-।' তিনি একটি সমাধির স্থিতির মধ্যে ছিলেন তখন। মহিলারা অন্যান্য গুজব ছড়িয়েছিল যে মীরা খুব অবাধে সাধুদের সাথে মিশেছে। মীরা এই ধরনের কলঙ্ক দ্বারা প্রভাবিত হননি এবং মন্দিরে কৃষ্ণ ভজনে তার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য ভক্তদের আমন্ত্রণ জানাতে থাকেন। রাজপরিবারের অভিযোগের মুখে তিনি নির্বিকার ছিলেন। তার বৈবাহিক দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, মীরা উত্তর দিয়েছিলেন যে একমাত্র কৃষ্ণই যার সাথে তার বিয়ে হয়েছিল, লৌকিক জীবনে তিনিই তাঁর স্বামী। সেটা শুনে রানার হৃদয় ভেঙ্গে গেছিল। মীরা গেয়েছেন :

BANGL

উড় যা রে কাগা বন কা
মেরে শ্যাম গয়া বহু দিন কা রে
কা রে কা রে
তেরে উদ্যা সু রাম মিলেগা
রামা রামা রামা
দোকা ভা গয়ে মন কা
ইত গোকুল উত মথুরা নাগরি
হরি হ্যায় গাদেহ বন কা
আপ তো যায়ে বিদেসা ছায়ে
হাম ভাসী মধুবন কা
মীরা কে প্রভু হরি অবিনাশী
চরণ কে ভাল হরিজন কা
উড় যা রে কাগা

কিংবদন্তী আছে মীরাবাইয়ের জীবনের মোড় ঘুরে যায় যখন আকবর এবং তার দরবারের সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন ছদ্মবেশে মীরার ভক্তিমূলক এবং অনুপ্রেরণামূলক গান শুনতে চিতোরে আসেন। দুজনেই মন্দিরে ঢুকে মীরার

আত্মনিবেদনের গীত শুনলেন তাদের হৃদয়ে দ্রবিভূত হল এমন মনকাড়া বিষয়বস্তুর আলোড়ন সৃষ্টিকারী - যাওয়ার আগে গান শুনে । বাদশা আকবর চলে, তিনি মীরার পবিত্র পা স্পর্শ করেন এবং উপহার হিসাবে মূর্তির সামনে অমূল্য রত্নগুলির একটি রত্নমালা রাখেন শ্রদ্ধার দান হিসেবে । কোনভাবে ভোজরানার কাছে খবর পৌঁছে যায় যে আকবর ছদ্মবেশে পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, মীরাবাইয়ের পা ছুঁয়েছেন এবং তাকে একটি রত্ন মালাও দিয়েছেন। এতে রানা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তিনি মীরাবাইকে বলেছিলেন, 'তুমি নিজেকে নদীতে বিসর্জন দাও এবং ভবিষ্যতে আর কখনও বিশ্বকে ওই পাপমুখ দেখিও না। তুমি আমার পরিবারের জন্য বড় অপমান বয়ে এনেছ।এগিয়ে গেলেন । মীরাবাই রাজার কথা মানলেন। তিনি নিজেকে নদীতে বিসর্জন দিতে " ভগবানের নাম'গোবিন্দ, গিরিধারী, গোপাল' সর্বদা তার ঠোঁটে থাকত। নদীতে যাওয়ার পথে তিনি আনন্দে গান গেয়ে নাচতে লাগলেন। তিনি মাটি থেকে জলের দিকে পা বাড়ালে পেছন থেকে একটা হাত তাকে জড়িয়ে ধরে। তিনি পিছন ফিরে দেখেন তার প্রিয়তম গিরিধারীকে। তিনি তখন তার কোলে অজ্ঞান হয়ে কয়েক মিনিট পর চোখ খোলেন। সেসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন এবং মৃদু ফিসফিস করে বললেন :'আমার প্রিয় মীরা, তোমার আত্মীয়দের সাথে তোমার জীবন এখন শেষ। তুমি আপন আনন্দে আনন্দিত থাকো। তুমি আছ এবং সবসময় আমার ছিলে।'

এরপরে রাজস্থানের গরম বালুকাময় বিছানায় খালি পায়ে হাঁটতে থাকেন মীরা। যাওয়ার পথে অনেক মহিলা, শিশু এবং ভক্তরা তাকে অত্যন্ত আতিথেয়তার সাথে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বৃন্দাবনধামে পৌঁছলেন। বৃন্দাবনে তিনি আবার সাক্ষাৎ করেন এবং সন্ত রবিদাসের বা রুইদাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। তিনি বৃন্দাবনে ভিক্ষাবৃত্তি করতে থাকেন এবং গোবিন্দ মন্দিরে উপাসনা করেন যা তখন থেকে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে এবং এখন সারা বিশ্ব থেকে ভক্তদের জন্য একটি মহান তীর্থস্থান।

এরপরে একদিন অনুতপ্ত রানা ভোজ মীরাকে দেখতে বৃন্দাবনে এসেছিলেন এবং প্রার্থনা করেছিলেন যে তিনি তার আগের সমস্ত অন্যায় এবং নিষ্ঠুর কাজের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। তিনি মীরাকে রাজ্যে ফিরে আসার অনুরোধ করেছিলেন এবং আরও একবার রানী হিসাবে তার ভূমিকা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। মীরা রানাকে বলেছিল যে কৃষ্ণ একমাত্র রাজা এবং তাঁর জীবন তাঁরই। রানা যেহেতু তাঁর স্বামী তাই দেহের ওপরে তাঁর অধিকার, কিন্তু মীরার মন, প্রাণ আর আত্মা জুড়ে শুধুই সেই রানাভোজ ।"গিরিধারী গোপাল", প্রথমবারের মতো, এতদিনে সত্যই মীরার উন্নত মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিল এবং শ্রদ্ধার সাথে তার সামনে প্রণাম করেছিল। এরপর তিনি অবিলম্বে বৃন্দাবন ছেড়ে যান যখন তখন এক পরিবর্তিত আত্মা এবং মীরাকে নিয়ে ফেরেন ।মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি মীরার একজন ভালো এবং সহানুভূতিশীল স্বামী ছিলেন।

তৈমুর কর্তৃক হিন্দুস্তান দখলের পর ইসলামী শাসনে আবদ্ধ দিল্লীর সুলতানের রাজত্বকালে রাজপুতেরা জোরপূর্বক নিজেদেরকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। কিন্তু ষোড়শ শতকে বাবর কর্তৃক সাম্রাজ্য দখল করলে

এবং কিছু রাজপুত তাকে সমর্থন করলে বাকীরা নিজেদের জীবনবাজী রেখে তার সাথে যুদ্ধ করে। মীরার স্বামী ভোজরাজ ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দের ঐ যুদ্ধে নিহত হয়।

বিয়ের মাত্র পাঁচ বছর পরে মীরার স্বামী নিহত হন মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে। এরপর আরও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তাঁর জীবন। মীরার শ্বশুর মীরাকে নির্দেশ দেন স্বামীর সাথে সহমরণে যেতে। কিন্তু মীরা দৃঢ়ভাবে তাঁর শ্বশুরকে জানিয়ে দেন যে তাঁর পক্ষে সহমরণে যাওয়া সম্ভব নয় কারণ তাঁর প্রকৃত স্বামী হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁর কোন মৃত্যু হয় না। মীরার এই যুক্তি শুনে তাঁর শ্বশুর প্রবল অসন্তুষ্ট হলেও রাজপরিবারের সম্মানার্থে মীরাকে ত্যাগ করতে পারলেন না। শ্বশুর রানাসঙ্গ যতদিন বেঁচেছিলেন প্রাসাদে থাকতে পেরেছিলেন তাঁর পুত্রবধূ।

কিন্তু এরপর সেটাও আর সম্ভব হল না। মীরার ২০ বছর বয়সী জীবনে মায়ের মৃত্যুর পর স্বামীর মৃত্যুর শোক ছিল ধারাবাহিক শোকের আরও একটি। তিনি মনে করলেন, ভালবাসায়ী।আবেগ সবকিছুই ক্ষণস্থা-প্রেম-

কৃষ্ণউপাসনা ছাড়ত-ে রাজি না হওয়ায় বাড়তে থাকে মীরার উপর অত্যাচার। এই মানসিক নিগ্রহের মূল হোতা ছিলেন মীরার দেওর, চিতোরের নতুন শাসক বিক্রমাদিত্য। বলা হয় তাঁকে হত্যার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন দেওর বিক্রমাদিত্য। তার মধ্যে সবথেকে বেশি চর্চিত হল চরণামৃত বলে দেওয়া বিষ যখন মীরা পান করেছিলেন, কৃষ্ণের কৃপায় তা বদলে গিয়েছিল চরণামৃততে। সাজিতে লুকিয়ে রাখা সাপ পাল্টে গিয়েছিল ফুলের মালায়। কাঠের পাটায় পেরেক দিয়ে মীরাকে হাঁটতে বাধ্য করলে সেই পেরেকগুলো গোলাপফুল হয়ে যায়। মীরা গাইলেন :

ম্যায় তো গোবিন্দ কী গুণ গানা।
রানা ভেজা ভিস কা পেয়ালা
ম্যায় চরণামৃত শোচ কে পিয়া
রানা ভেজা জো ভুজঙ্গা
ম্যায় তো হার করকে পেহনা
ম্যায় তো গোবিন্দ কী গুণ গানা

কৃষ্ণপ্রেমে মত্ততা মীরার একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় হলেও কখনও কখনও এই মত্ততা নিয়ে তাকে শহরের অলি-চিতোরগড়ের নতুন শাসক বিক্রমাদি গলিতে নাচতে দেখা যেত । তার দেবর ওত্য ছিলেন দুষ্টপ্রকৃতির যুবক। -মীরা'র খ্যাতি, সাধারণ ব্যক্তিদের সাথে তার মেলামেশা এবং নারী হিসেবে লজ্জাশীলতা না থাকায় কয়েকবারই বিক্রমাদিত্য তাকে বিষ মিশিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। এছাড়াও, তার ননদ উদাবাঈ মীরা'র সম্বন্ধে বিভিন্ন দূর্নাম রটাতে থাকেন। এর কিছুদিন পর মীরা গুরু হিসেবে রবিদাসের নাম ঘোষণা করেন যিনি জাতিতে ছিলেন চর্মকার।মীরা তার গুরু এবং পরামর্শদাতা রুইদাসের সাথে দেখা করেছিলেন, যিনি ১১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন বলে জানা যায়। এই মহান শিক্ষকের সৎসঙ্গে থাকতে তিনি প্রায়ই বস্তিতে

যেতেন। তিনি তার গানে কুলাম সম্পর্কে যে অনেক প্রশ্ন এবং বিতর্ক উত্থাপন করেছিলেন তার পিছনে এটি ছিল প্রেরণা এবং অনুপ্রেরণা।

এবং বৃন্দাবনে কৃষ্ণনাম করতে করতে চলে যান। তিনি মনে করতেন যে, তিনি পূর্বজন্মে গোপী হিসেবে ললিতা নামে কৃষ্ণপ্রেমে পাগল ছিলেন। মীরা'র অভিমত যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র পরমপুরুষ হচ্ছেন প্রভু শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সন্ন্যাসব্রত অব্যাহত রাখলেন এবং নৃত্যসহযোগে উত্তরভারতের বিভিন্ন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বেড়াতে লাগলেন।

এমনই সময়ে মীরাবাঈ চিঠি লিখছেন পরামর্শ চেয়ে তুলসীদাসজীর কাছে, মীরাবাঈজীর চিঠির বয়ান ছিল এটা :

BANGL

স্বস্তি শ্রী তুলসি সুখনিধান দুখ হরণ গোসাঁই,
বারমবার প্রণাম করাহু, অব হরহু শোকা সমুদাই,
ঘর কে স্বজন হামারে জেতে সবহু উপাধি বড়াই,
সাধু সঙ্গ আর ভজন করত মহিম দেতা কলেশা মহাই,
বালাপানাতে মীরা কিনহি, গিরিধরলালা মিতাই,
সো তোম অব ছুটোই নেহিম কয়মহুম,
লাগি লগান বরিয়াই
মেরে মাতাপিতা কে সমহও, হরিভক্তনহা সুখ দায়ী,
হামকো কাহা উচিত কারিব হ্যায়, সো লিখিয়ে সমুঝাই।
(মীরার চিঠি গোস্বামী তুলসীদাসজীকে)

অর্থ স্বস্তি শ্রীতুলসীদাসজী -, পরম উপকারী ও আশিস ও আনন্দের উপকারকারী, আপনার শ্রীচরণে বারংবার আমি প্রণাম করি, দয়া করে আমার অসীম দুঃখ ও কষ্টের অবসানের রাস্তা দেখান।

আমার শ্বশুরবাড়ির পরিবারের সবাই, যারা যারা আমার বাড়িতে আছেন, তারা সর্বদা অতি সমস্যা তৈরী করছেন আমার সন্তদের সাথে মেলামেশা ও ভজন কীর্তন নিয়ে যা আমাকে ভীষণ দুঃখিত ও বিষন্ন করছে।

সেই শৈশব থেকে আমার গিরিধারিলালের সাথে বন্ধুত্ব যা এখন এমন হয়েছে যে সেটা ভাঙ্গা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আমার চোখে হরিভক্তরা আমার মা বাবা অভিভাবক সম /, সেইজন্য আমি আপনার কাছে পরামর্শ চাইছি আমার কী করা উচিৎ।

তুলসীদাসজী তাঁর বিনয় পত্রিকায় তাঁর উত্তরটা দিয়েছিলেন এভাবে :

জাকে প্রিয় না রাম বৈদেহী
সো ত্যাজি কোটি বৈরী সম যদ্যপি পরম সনেহী।
ত্যাজো পিতা প্রহ্লাদ বিভীষণ ভরত বন্ধু মহাতারি
বলি গুরু ত্যাজো, কান্ত ব্রজ বলিতানি
ভয় মুদ মঙ্গলকারী।
নাতে নেহ রামকে মনিয়াত সুহৃদ সুসেব্য জাহালো
অঞ্জন কাহা আঁখি যেহি ফুটে বহুতক কাহো কাঁহা লো
তুলসী সো সব ভাতি পরম হিত পূজ্য প্রাণেতে প্যারো
যাসো হোয়ে পরম রাম পদ এতো মতো হামারো। -

অর্থ যাদের রাম ও সীতা প্রিয় নন -, তাদেরকে ত্যাগ করো, যদি তারা তোমার খুব ঘনিষ্ঠ ও ভীষণ প্রিয়ও হয়, তবুও কারণ তারা কোটি শত্রুসম।

বিষ্ণুর জন্য প্রহ্লাদ তার পিতা হিরণ্যকশিপুকে ছেড়েছিল, তেমনই বিভীষণ ত্যাগ করেছিল ভাই রাবণকে, আর ভরত ত্যেজেছিলেন মা কৈকেয়ীকে।

দৈত্যরাজ বলি ত্যেজেছিলেন গুরু শুক্রাচার্য্যকে আর গোপীরা ত্যাগ করেছিলেন তাদের স্বামীদের কৃষ্ণর দিক নেবার জন্য আর তাই তারা হয়ে আছেন পবিত্রতা ও আনন্দময়তার মূর্তি ও প্রতীক ।

যেকোনো সুহৃদ, আত্মীয়, পরিজন ততক্ষন প্রিয় থাকেন যতক্ষণ তাদের কাছে রামের প্রতি ভক্তি ও (সুসেব্য) রামের প্রতি ভালোবাসার নিরিখে সব আত্মীয়) ভালোবাসা থাকে সেই নিরিখে।, পরিজন, বন্ধু প্রিয় হয় ।(!কী ভালো গুণ প্রয়োজন যদি তা আঁখিকে অন্ধ করে দেয় (অঞ্জন) কাজলের

যে রামচন্দ্রের চরণকমলের প্রতি তোমার প্রেম বর্ধন করতে পারে (তোমার ইষ্টের), সেই তোমার পক্ষে উপকারী, পূজনীয় এবং প্রিয় হওয়ার যোগ্য নিজেদের প্রাণের চেয়েও, এটাই আমার মত।মীরাবাঈ ছিলেন রামানন্দী সম্প্রদায়ের ভক্ত এবং গুরু রবিদাস শিষ্য। (রুইদাসজীর)

শেষে হাজারো অপবাদ আর গিরিধারীর মূর্তি নিয়ে মীরা চলে আসেন মেরতায়। কিন্তু সেখানেও মন বসেনি। এরপর মীরা চলে যান তাঁর আরাধ্যের লীলাভূমি বৃন্দাবনে। মীরা গাইলেন :

চলা ভাহী দেশ প্রীতম , পাবান চলা ভাহী দেশ .. তক..
কাহো কসমাল সারি রাঙাভান কাহো তো ভগবান ভেশ

কাহো তো মোতিয়ান মাঙ ভারভান , কারণ ছিতাকাভান কেস
মীরা কে প্রভু গিরাধারানাগর, সুন্যায্য বিদ্যাদ নরেশ ..

শব্দার্থ চল সেই দেশ যেখানে কুসুমের রঙ্গ লাল -, সুমন্দ পবন বয়, ভগবানের সাজানো সেই বেশ, যেখানে মোতি মেলে ভারে ভারে, যাতে মন উচাটন করে। যেখানে আছেন মীরার প্রভু গিরিধর নাগর যিনি সুন্যায্য বিদ্যার রাজা আবার মীরার প্রিয়তম।

তার দেবর রানা বিক্রমাদিত্য সিংহের দ্বারা তার প্রানহানির চেষ্টা এবং মানসিক নির্যাতনের পর, মীরাবাই চিত্তরগড় ত্যাগ করে মের্তায় পৌঁছে যান এবং ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে তার জ্যেঠা বীরামদেবের সাথে থাকতে আরম্ভ করেন। মীরা গাইলেন :

হরি মেরে জীবন প্রাণ আঁধার,
অউর আসারো না হী তুম বিন,
তিনন লোক মাঝার,
আপ বিনা মোহে কাছু না সুহাবে,
নিরাখ সব সংসার,
মীরা কাহে মেইন দাসী রাবড়ি,
দিজ্য মতি বিসর।

BANGL

যোধপুর থেকে রাও মালদেব মের্তা আক্রমণ করলে, বীরমদেব মীরাবাইকে নিয়ে মের্তা ছেড়ে চলে যান ! মীরাবাই বীরামদেবকে ছেড়ে বৃন্দাবনে পৌঁছেন, সেখানে প্রায় পাঁচ বছর অবস্থান করে স্থায়ীভাবে দ্বারকায় চলে যান চিত্তোরগড় ছেড়ে যাওয়ার পর তিনি আর ফিরে আসেনি।তিনি !1546 খ্রিস্টাব্দে দ্বারকায় ভগবান কৃষ্ণের মূর্তির সাথে মিলিত হন!

কারো কারো মতে, তিনি ছদ্মবেশে দ্বারকা ছেড়েছিলেন দক্ষিণ ভারতের তীর্থযাত্রার জন্যদক্ষিণ ভারত থেকে ! ফেরার সময়, তিনি রাজা রামচন্দ্র বাঘেলার রাজ্য বান্ধবগড়এ তানসেন এবং বীরবলের সাথে দেখা - কিলোমিটার দূরে চিত্রকূটে তুলসীদা ৯০বান্ধবগড় থেকে !করেছিলেনসের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিলপরে ! পরে !অম্বরে যাওয়ার সময় মানসিংহের সাথে তার দেখা হয় এবং তার মাধ্যমেই আকবরের সাথে দেখা হয় তিনি ফিরে আসেন এবং বেট দ্বারকায় থেকে যান এবং65 বছর বয়সে তিনি মারা যান!

জীবনের এই পর্বে মীরা আর রাজকুমারী নন। পুরোপুরি সাধিকা। তাই তিনি গাইলেন :

রাম কাহিয়ে গোবিন্দ কাহিয়ে
রাম কাহিয়ে গোবিন্দ কাহিয়ে

করম কী গতি ন্যারী সন্তো
বড়ে বড়ে নয়ন দিয়ে মিরাগান কো
বন বন ফিরত উঘারী সত
করম কী গতি ন্যারী সন্তো
উজ্জ্বয়াল বরণ দিনহি বাগালন কো
কোয়েল কর দিনহি কারী সত
করম কী গতি ন্যারী সন্তো
অরো দীপন জল নির্মল কিনহি
সৌদার করতী নিখারী সত
করম কী গতি ন্যারী সন্তো
মুরখ কো তুম রাজ দিয়াত হো
পণ্ডিত ফিরত ভিখারী সত
করম কী গতি ন্যারী সন্তো
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগুন
রাজাজি কো কৌন বিচারী সত
করম কী গতি ন্যারী সন্তো
বড়ে বড়ে নয়ন দিয়ে মিরাগান কো
বন বন ফিরত উঘারী সত
করম কী গতি ন্যারী সন্তো

BANGL

শোনা যায় এই সময় বৃন্দাবনে ছিলেন চৈতন্যের শিষ্য শ্রীরূপগোস্বামী। মীরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান | কিন্তু একজন মহিলার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হননি রূপশ্রীরূপ গোস্বামী।ইনি সে সনাতনের-ই শ্রীরূপ আর সনাতন গোস্বামী যাঁরা সেই বাঙ্গালী কবি কালিদাস রায়ের কবিতায় বর্ণিত হয়েছেন,

“রূপ সনাতন রহেন দুজন সাধন ভজন রত,
কে আসে কে যায় ব্রজে তার খোঁজ রাখেন না অতশত।”

যারা তর্কযুদ্ধে এক পন্ডিতকে হারিয়েছিলেন বলে চৈতন্যদেব দ্বারা ভর্ৎসনা শুনেছিলেন,

“যশ প্রতিষ্ঠা শুকরী বিষ্ঠা মেখে এলে সারা গায়।”

সেই শ্রীরূপ গোস্বামীর এই প্রত্যাখানে ভেঙে পড়েননি মীরা।মীরা উত্তর দিয়েছিলেন তাঁকে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র পরমপুরুষ হচ্ছেন প্রভু শ্রীকৃষ্ণ বলেই তিনি মানেন, বাকী সকলেই তো নারী, ব্রজধামে তো সকলেই

নারী বা গোপী, একমাত্র পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, তাই এক নারীর সাথে আরেক নারীর সাক্ষাতে তো কোনো সংকোচ থাকার কথা নয়। উত্তর শুনে লজ্জিত হয়েছিলেন মহাত্মা এবং তখন দেখা করেছিলেন শ্রীরূপ গোস্বামী মীরার সাথে।

বৃন্দাবন থেকে শুরু হয় তাঁর ভক্তি আন্দোলন। পায়ে হেঁটে তিনি চষে ফেলেন উত্তরভারতের প্রতিটি কোণা। শোনা যায় কাশীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কবীরের। মীরা'র সাথী হিসেবে বারাণসীতে কবীরের সাথে ঘনিষ্ঠতা সামাজিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল।

গড় সে তো মীরাবাঈ উতরি, কভা লে নু সাথ
গাওঁ কো ছোড়া মীরা মেধ, তো পুস্কর নাহভা যায়ে
রাম কৃষ্ণ হরি জয় জয় রাম কৃষ্ণ হরি।
মেরো মন লাগয়ো হরি কে নাম
হর কে নাম রহে স্যায়া সাধা কে সাদ
রানা জী উঠি ভেজা দ্বিজ মীরাবাঈ হাত
গড় সে তো মীরাবাঈ উতরি, কভা লে নু সাথ
গাওঁ কো ছোড়া মীরা মেধ, তো পুস্কর নাহভা যায়ে
রাম কৃষ্ণ হরি জয় জয় রাম কৃষ্ণ হরি।
ঘর কী মানন ইস্ত্রি মুদ রা চলি রাঠাড
লাজ পিহার শাসড় , লাজে তেরো সো পরিবার
গড় সে তো মীরাবাঈ উতরি, কভা লে নু সাথ
গাওঁ কো ছোড়া মীরা মেধ, তো পুস্কর নাহভা যায়ে
রাম কৃষ্ণ হরি জয় জয় রাম কৃষ্ণ হরি।
লাজে মিটা জী থারা মায়াদ বাপ
মীরাবাঈ কাগদ ভেজা দ্বিজ রানা জী রে হাত
গড় সে তো মীরাবাঈ উতরি, কভা লে নু সাথ
গাওঁ কো ছোড়া মীরা মেধ, তো পুস্কর নাহভা যায়ে
রাম কৃষ্ণ হরি জয় জয় রাম কৃষ্ণ হরি।

দেশ জুড়ে তীব্র হয় ভক্তি আন্দোলন। কবীরের দোঁহার মতো ছড়িয়ে পড়ে মীরার ভজন। রাজস্থানিব্রজবুলি - হিন্দিতে মেশানো এই ভজন একইসঙ্গে ভক্তি আর, প্রেম আর বিরহের কথা বলে। সরল ছন্দে বাঁধা এই ভজন পদ, মধ্যযুগে ভারতের ভক্তি আন্দোলনের প্রধান অস্ত্র হয়ে ওঠে।

শেষের বছরগুলোতে সন্ন্যাসিনী হয়ে গুজরাটের দ্বারকায় মীরাকে দেখা গিয়েছিল। শোনা যায়, জীবনের শেষ দিনগুলো গুজরাতের দ্বারকায় কাটিয়েছিলেন মীরা। জনশ্রুতি, মন্দিরে গিরিধারীর মূর্তিতে বিলীন হয়ে যান তিনি। এরকম কিংবদন্তি আরও ছড়িয়ে আছে মীরার জীবন জুড়ে।

আরেক কিংবদন্তী এমন আছে যে সেদিন কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথিতে কৃষ্ণের মন্দিরে বিশাল উৎসবে মুখর। প্রভুর বাসস্থানে চারিদিকে প্রভূত আনন্দ। প্রদীপের আলো, ভজনের ধ্বনি এবং ভক্তদের উচ্ছ্বাসের শক্তি বাতাসকে ভরিয়ে দিচ্ছিল। এক হাতে তম্বুরী আর অন্য হাতে করতাল বা চিপলা নিয়ে মহান তপস্বিনী তার বন্ধ চোখের সামনে তার গোপালকে দেখে হাসতে হাসতে উল্লসিতভাবে গান গাইছিলেন। মীরা উঠে দাঁড়ালেন এবং তার ‘মেরে জনম মরণ কে সাথি’ গানের সাথে নাচছিলেন এবং গানটি শেষ হলে রানা আলতোভাবে তার কাছে এসে তাকে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। মীরা বলল, ‘রানাজী, শরীরটা তোমার আর তুমি বড় ভক্ত, কিন্তু আমার মন, আবেগ, আত্মা সবই তার। আমি জানি না তোমার এই মানসিক অবস্থায় আমার কি লাভ।’

BANGL

মাই মাই হো মাই মাই
মাই মাই ক্যাইসে জিয়ুন রে
ক্যাইসে জিয়ুন রে
মাই মাই ও মাই মাই
হরি বিন ক্যাইসে
ক্যাইসে জিয়ুন
মাই মাই ও মাই মাই
উদক দাদুর পিনভাত হ্যায়
জল সে হী উপযাই
পর এক জল কো মীন বিসরে
তড়পত মর যাই
মাই মাই ও মাই মাই
মাই মাই ক্যাইসে জিয়ু রে
পিয়া বিন পিলি ভাই রে
জো কাত ঘুণ খায়ে
আউশধ ভুলেন সঞ্চারাই রে
বালা বৈধ পীর জয়ে

মাই মাই ও মাই মাই
মাই মাই ক্যাইসে জিয়ু রে
হোয়া উদাসী বন বন ফিরুন
রে বিথা তন ছাই
দাসী মীরা লা গিরিধর মিল্যা হাই সুখদায়ী
মাই মাই ও মাই মাই
মাই মাই ক্যাইসে জিয়ু রে
হরি বিন ক্যায়সে জিয়ু রে।

রানা সরে গেলেন এবং তিনি তার সাথে একযোগে গান গাইতে লাগলেন। মীরা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, হোঁচট খেয়ে গিরিধারীর পায়ে ফুলের কাছে পড়লেন। 'ওহ, গিরিধারী, তুমি কি আমাকে ডাকছ, আমি আসছি।' রানা এবং বাকিরা যখন অবাক হয়ে দেখছিল, তখন একটা বাজ পড়ল যা মীরাকে আচ্ছন্ন করে দিল এবং গর্ভগৃহের দরজাগুলি নিজেরাই বন্ধ হয়ে গেল। যখন আবার দরজা খুলল, মীরার শাড়িতে ভগবান কৃষ্ণের মূর্তি ঢেকে ছিল এবং তার কণ্ঠস্বর এবং বাঁশির সঙ্গত কেবল শোনা যাচ্ছিল। মীরাবাঈ গাইলেন :

BANGLADARSHAN.COM

হ্যায় আঁখ বো
জো শ্যাম কা দর্শন কিয়া কারে
হ্যায় শীশ জো প্রভু চরণ মেঁ
বন্দন কিয়া কারে
[বেকার বো মুখ হ্যায়[
জো র‍্যাহে ব্যর্থ বাতোঁ মেঁ
বেকার বো মুখ হ্যায়
জো র‍্যাহে ব্যর্থ বাতোঁ মেঁ
মুখ বো হ্যায় জো হরিনাম কা
সুমিরান কিয়া কারে
হীরে মোতী-
হীরে মোতী সে নেহীঁ
শোভা হ্যায় হাথকী
হ্যায় হাথ জো ভগবান কা
পূজন কিয়া করে

মার কার ভী অমরনাম হ্যায়
উস জীবকা জাগ মেঁ
প্রভু প্রেম মেঁ বলিদান জো
জীবন কিয়া করে।
এ্যায়সী লাগী লাগান-
এ্যায়সী লাগী লাগান-
এ্যায়সী লাগী লাগান
[লাগী লাগী রে লাগান২-[
[এ্যায়সী লাগী লাগান
মীরা হো গাঈ মাগান২-[
বো তো গ্যলী গ্যলী
হরী গুণ গানে লাগী
[এ্যায়সী লাগী লাগান
মীরা হো গাঈ মাগান২-[
বো তো গ্যলী গ্যলী
হরী গুণ গানে লাগী
[মেহেলোঁ মেঁ পালী
বানকে জোগান চালী২-[
মীরা রানী দীবানী কাহানে লাগী
এ্যায়সী লাগী লাগান
মীরা হো গাঈ মাগান
বো তো গ্যলী গ্যলী
হরী গুণ গানে লাগী
এ্যায়সী লাগী লাগান
মীরা হো গাঈ মাগান।
কোঈ রোকে নাহীঁ কোঈ টোকে নাহীঁ
মীরা গোবিন্দ গোপাল গানে লাগী
[কোঈ রোকে নাহীঁ কোঈ টোকে নাহীঁ২-[
মীরা গোবিন্দ গোপাল গানে লাগী

BANGL

[ব্যয়ঠী সান্তো কে সাঙ্গ রাঙ্গী মোহন কে রাঙ্গ
মীরা প্রেমী প্রীতম কো মানানে লাগী২-[
বো তো গ্যলী গ্যলী হরী গুণ গানে লাগী
এ্যায়সী লাগী লাগান মীরা হো গাঈ মাগান
বো তো গ্যলী গ্যলী হরী গুণ গানে লাগী
মেহেলোঁ মেঁ পালী বানকে জোগান চালী
[বানকে জোগান চালী১২-[
মেহেলোঁ মেঁ পালী বানকে জোগান চালী
মীরা রানী দীবানী কাহানে লাগী
এ্যায়সী লাগী লাগান মীরা হো গাঈ মাগান
[রাণা নে বিষ দিয়া মানো অমৃত পিয়া২-[
মীরা সাগর মেঁ সারিতা সমানে লাগী
[দুখ লাখো সেহে মুখ সে গোবিন্দ কাহে:,
মীরা গোবিন্দ গোপাল গানে লাগী২-[
বো তো গ্যলী গ্যলী হরী গুণ গানে লাগী
এ্যায়সী লাগী লাগান মীরা হো গাঈ মাগান
বো তো গ্যলী গ্যলী হরী গুণ গানে লাগী
মেহেলোঁ মেঁ পালী বানকে জোগান চালী
মীরা রানী দীবানী কাহানে লাগী
[এ্যায়সী লাগী লাগান মীরা হো গাঈ মাগান৩-[

BANGL

মীরা'র গানগুলো সাধারণ ধারারই পদ, শ্লোক বা চরণ যা আধ্যাত্মিক গানেরই অংশবিশেষ। পদগুলো একত্রিত হয়ে মীরা"'র পদাবলীবা মীরা "'র ভজন নাম ধারণ করে। বর্তমানে প্রচলিত অনুবাদগুলো রাজস্থানী ভাষায় এবং কৃষ্ণের জন্মভূমি বৃন্দাবনে হিন্দীতে ব্রজ ভাষায় ব্যাপক হারে উচ্চারিত হচ্ছে। পদগুলোর কিছু কিছু আবার রাজস্থানী এবং গুজরাটি উভয় ভাষায়ই লিখিত। -

রাজস্থানের লোকভাষায় লেখা মীরার কবিতাগুলিকে পদ বা চরণ হিসাবে অভিহিত করা হয়। প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি হল ‘টেক’, যা কবিতার সারবস্তুকে সংক্ষেপে উল্লেখ করে। পরের অংশ ‘অন্তরা’, যেখানে মূল ভাবের সম্প্রসারণ ঘটানো হয়। মীরার লেখাগুলি ছয় থেকে চব্বিশ পঙ্‌ক্তি অবধি বিস্তৃত। অধিকাংশ কবিতাই যে হেতু সঙ্গীতে রূপায়িত, তাই সেখানে রাগের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। বহু গান রচিত পিলু রাগের ওপর, যা উচ্ছ্বাসের রাগ,

একই সঙ্গে অস্থিরতারও। প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়ার যে উচাটন, তা পিলুর শুদ্ধ ও কোমল গান্ধার এবং নিষাদে নিজেকে অনায়াস ব্যক্ত করে। এবং দেশ, সারং, ভৈরবী, ভীমপলশ্রী মিলিয়ে সত্তরের কাছাকাছি রাগে মীরার পদগুলি সুরারোপিত। বোঝা যায়, মীরার কাব্য ও সঙ্গীত দক্ষতা কতখানি সুদৃঢ় ছিল। মীরা যেমন ভাবে কৃষ্ণকে দেখেছে, তাছেই লিখেছে কথ্য ভাষায়। সেখানে অলঙ্কার প্রযুক্ত হয়ে-, কিন্তু তার অন্তর্বস্তু দুরূহ হয়ে ওঠেনি। ভক্তির প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন ভাবের মধ্যে মীরার লেখায় সখ্য ও আত্মনিবেদনের রূপ সুস্পষ্ট।ভক্তির এই ছত্রছায়ায়, প্রকৃত ভক্তদের সান্নিধ্যে শ্রেণি, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বেশেষে জায়গা করে নিয়েছিল সমস্ত প্রান্তিক মানুষ।

তাঁর কবিতায় কৃষ্ণ হলেন একজন যোগী এবং প্রেমিকা এবং তিনি নিজেই যোগিনী ছিলেন তাঁর পাশে তাঁর স্থানকে আধ্যাত্মিক দাম্পত্য সুখের দিকে নিতে প্রস্তুত।মীরার শৈলীতে সর্বদা কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে মুগ্ধতা, মানসিক চাপ, আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা, আনন্দ এবং মিলনের আর্তি রয়েছে।

BANGL

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরো না কোই
যাকো শর মোর মুকুট মেরে পতি ওহী
কোই কহে কারো কোই কহে গোরো
মেরো কয় আঁখিয়ো খোল
কোই কহে হালকো কোই কহে ভারো
হিয়ো হৈ তারাজু তোল
কোই কহে ছানে কোই কহে চাইনে।
মিও হৈ বাজুন্ত ঢোল
তন কা গহনা সব কুছ দিনা
দিয়া হৈ বাজুবন্ধ খোল।

যদিও মীরা নির্গুণ ব্রহ্মত্বের আধ্যাত্মিকতা এবং উত্তরের শান্ত ভক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন, তবুও সন্দেহ নেই যে তিনি তার হৃদয়, মন ও মন্দির শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণকে ঠাঁই দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন যে প্রিয়া ও প্রভু হিসেবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিদ্যমান। তার কবিতাগুলোয় কৃষ্ণের পদচরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কথকতা বর্ণিত আছে। কবিতায় কৃষ্ণের প্রিয় রঙ গোধূলীতে রঙ্গীন হবার বাসনার কথাও মীরা উল্লেখ করেছেন।

কিনু সঙ্গ খেলু হোলি, কিনু সঙ্গ খেলু হোলি
পিয়া ত্যাজ গয়ে হ্যায় আকেলি, কিনু সঙ্গ খেলু হোলি
মানিক মোতি সব হাম ছোড়ে

গলে মে পেহানি শেলী
ভোজন ভবন ভালো নেহি লাগে
পিয়া করণ ভায়ে রাঙ্গেলি
মুঝে দুরি কিউঁ মেলি
অব তুম প্রীত হামর সু জোড়ি, হামসে কর কিউঁ পাহেলী
ভূ দিন বীতে আজাহু না আয়ে, লাগ রাহি তালাবেলি
কিনু বিন মায়ে হেলি
শ্যাম বিনা জিয়ারো মুরঝাবে
যায়সী জল বিন ভেলি
মীরা কো প্রভু দর্শন দিজো
ম্যায় তো জনম জনম কী ছেলি
দর্শন বিনা খাড়ি দুহেলী।

মীরাবাঈয়ের গান ও তাঁর সম্প্রদায়ে তাঁর সম্পর্কে যে গল্প প্রচলিত আছে তার ভিত্তিতে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়। এই জীবনবৃত্তান্ত অবলম্বনে একাধিক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। তবে এই সব গল্পের ঐতিহাসিক ভিত্তি অবিতর্কিত নয়। বিশেষত, যে সব গল্পে তানসেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রদর্শিত হয়েছে সেগুলি যথেষ্টই বিতর্কিত। আবার মীরা রবিদাস না রূপ গোস্বামীর শিষ্যা ছিলেন, তা নিয়েও বিতর্ক আছে।

জো তুম ছোড়ো পিয়া
ম্যায় নাহি ছড়ু রে
তোষাই প্রীত জোড়ি কৃষ্ণা
কৌন সঙ্গ জরু রে ...
মীরা নেই তো কেহ ডালা,
ম্যায় ক্যা বলু মেরে রাম,
ইস কলযুগ কে ভূলভালাইয়া মেন খোয়ে
মেরে ওহ সাবারাই, সুন্দর শ্যাম
জনম সে হয়, ইসস ব্যাকুল মন মেন,
ইক প্যায়াস আজীব সমায়ী হয়
ম্যায় ভী বনু ইক দিন পিয়া কী প্যারী
যেহ তুঝে সে দোহাই হয়

ইতনা তোই বাতলা দে ও ভগবান
ইস ভনোয়ার মেন জো তুনে উতারা হয়
মেরে কানহা কো ভী ইস কলযুগ মেন
বেশক তোনে কাহি বানায়া হয়
মন মেইন বসি হয় মোরে প্রভু
মীরা কী হে মধুর বাণী,
তন মেন অগণ জ্বলে হয় মোরাই
রাধা সে মেই প্রেম দিওয়াণী
ইস মাতওয়ালি কারী দুনিয়া মেন
মোরাই কানহা, তোহে কহান ঢুন্ধু মেই,
মেন তোরি রাহ একটুক হো দেখু
বাস অউর কুছ ভী না জানু মেই
পল ভী যেহ আস নেহি মিট পাতী -
কে এক দিন তু ভী আয়েগা,
ইস বাওয়াড়ি, আকেলি বৈরাগান কো হে
তু সপ্রেম আপনি রাধা বানায়েগা।

BANGL

মীরার কৃষ্ণও তাই রক্তমাংসের চিরপ্রেমিক। এই প্রেমিক দেবতা বটে, কিন্তু মীরা তাকে শুধু মালা দিয়ে পুজো করতে চায় না, সাজাতেও চায়। গান দিয়ে তুষ্ট করতে চায় না, প্রীত করতে চায়। মীরা চায় কৃষ্ণের সঙ্গে অঙ্গীভূত হতে, তাই বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের যুগল মুরতি দেখে মনে মনে সে রাধার অবস্থানে নিজেকে উপনীত করে। মানব ও দেবতার মধ্যে তখন আর উচ্চনীচ ভেদ থাকে না। সখ্য তৈরি হয়। সে ঈশ্বর দীনের ঈশ্বর, বঞ্চিতের ঈশ্বর, দৈনন্দিনতায় যাকে খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, পরম আশ্লেষ দিয়ে আগলে রাখতে পারে যে কেউ। ভক্তি আন্দোলনের সার্থকতা সেখানেই। যে মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলন বৃহত্তর ভারত রাষ্ট্র জুড়ে ব্যাপকতা লাভ করে, সেখানে, দেবালয়ে গিয়ে ঈশ্বরকে উপাসনার অধিকার কেবল সংস্কৃতজ্ঞ উচ্চবর্গের হিন্দু পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ অনেকাংশে নিম্নবর্গ আর নারীজাতিরও ইতিহাস, ঈশ্বরের সাধনায় ব্রাহ্মণ পুরুষের একচ্ছত্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ইতিহাস, যার মাধ্যম কোনও অসহিষ্ণুতা অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে তলোয়ার চালানো ছিল না। ছিল কাব্য ও সঙ্গীত। ছিল পিতৃতান্ত্রিক দেবভাষা বর্জন করে, মাতৃতান্ত্রিক আঞ্চলিক ভাষায় প্রিয়ের আরাধনা।

আই তী তে ভিস্তি জনী জগত দেখকে রোই।
মাতাপিতা ভাইবন্দ সাত নহী কোই।
মেরো মন রামনাম দুজা নহী কোই॥
সাধু সঙ্গ্ বৈঠে লোক লাজ খোই।
অব তো বাত ফৈল গই।
জানত হৈ সব কোই॥

অর্থ জনন -ীর গর্ভজল থেকে বেরিয়ে ধরিত্রীর বুকে এসে ক্রন্দন করেছিলাম। আজ মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, কেউ পাশে নেই৷ আমার হৃদয়েও রামনাম ছাড়া আর কিছু নেই। লোকলজ্জা খুইয়ে সাধুদের সঙ্গে বসে থাকি। এ কথা এখন সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে, সকলেই সব জানে।

যুগে যুগে ভারতে বহু রাজকন্যা ও রাণী এসেছে আর চলে গেছে। অনেক রাজকন্যা, রাণী এই পৃথিবীর মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে এবং হারিয়ে গেছে। চিতোরের রাণী একা কী করে আজও সবার স্মৃতিতে উজ্জ্বল? এটা কি তার সৌন্দর্যের জন্য? এটা কি তার কাব্যিক দক্ষতার কারণে? না। এটা তার ত্যাগ, ভগবান কৃষ্ণের প্রতি একক ভক্তি এবং আত্ম উপলব্ধির কারণে। তিনি কৃষ্ণের সাথে কথা বলেছেন। তিনি তার প্রিয়তমা কৃষ্ণের-সাথে ভোজন করেছিলেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমরস পান করেন। তিনি তার অনন্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তার হৃদয়ের মূল থেকে গেয়েছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রেমভক্তির সর্বপ্রথম মূর্ত প্রতীকগ:ুলির মধ্যে একজন ছিলেন যা পৃথিবীতে বিচরণ করেছিল।

এরকম গল্পকিংবদন্তি কতটা সত্যি-, কতটা লোকমুখে প্রচারিত, সেই হিসেব থেকে গেছে সমাজতাত্ত্বিকদের খাতায় কলমে।এই রাজপুত নারী বরং শিখিয়ে গেছেন বিশ্বাসে " - "বিনা প্রেমসে নেহি মিলে নন্দলালা" - মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূরকৃষ্ণপ্রেমে বিলীন হতে প্রাসাদের বিলাসিতা ত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি ।"
র ভাগী হয়ে ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিলেন। শুধু নিজের প্রেমকে বিসর্জন দেবেন না বলে। যে তিনি।কলঙ্কে ঈশ্বরকে পায় তার যে আর কোনো কিছুরই প্রয়োজন পড়ে না, তিনিই যে তাকে আগলে রেখে নিজের মধ্যে টেনে নেন। চৈতন্য মহাপ্রভু তার আরেকটা উদাহরণ।

ভক্তিরসে আদতে যে কোথাও অসহিষ্ণুতা নেই, জোলা কবীরের গায়ে স্বামী রামানন্দের পা লাগলে একে অন্যকে বেছে নিতে পারে গুরু আর শিষ্য হিসেবে, সেই সন্ত কবীরই আবার দোঁহা রচনার মধ্যে দিয়ে সর্বময়ের অস্তিত্বকে প্রশ্ন করতে পারে– ভক্তির, ভক্তের এ হেন ঔদার্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতকে অনেকখানি আধুনিকতর প্রতিপন্ন করে, অন্তত একুশ শতকের ভারতের সাপেক্ষে। ভক্তিবাদসুফিবাদের - মধ্যেকার মুক্তচিন্তাকে ভারতের সংস্কৃতি শতাব্দীকালব্যাপী ধারণ ও লালন করতে চেয়েছে। প্রতিহতও হয়েছে, বলা বাহুল্য। এখনও হচ্ছে, কেবল তার ধরনটুকু বহিরঙ্গে ভিন্ন।

আজকের কজন আধুনিকা এই মধ্যযুগীয় নারীর মতো এতটা সাহসী হতে পারবেনযিনি ঘোর পুরুষতান্ত্রিক - সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নিজের মতো করে কাটিয়েছেন আজীবন কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে,আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে?

নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে

নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে

॥পিতৃপক্ষ উমা এবং॥

প্রথম পর্ব:-

পিতৃপক্ষ, মহালয়া, দেবীপক্ষ:-

****

কাল মহালয়া গেল। অনেকেই জানি মহালয়া তিথির তাৎপর্য, আবার অনেকেই জানিনা। আমি জানতাম না, চেষ্টা করেছি জানতে, সেটুকুই আলোচ্য বিষয়।

মহালয়া হচ্ছে পিতৃপক্ষের শেষ দিন এবং দেবী পক্ষের শুরুর পূর্ব দিনে পিতৃপক্ষে আত্নসংযম করে দেবীপক্ষে শক্তি সাধনায় প্রবেশ করতে হয়। দেবী শক্তির আদিশক্তি, তিনি সর্বভূতে বিরাজিতা। তিনি মঙ্গল দায়িনী করুণাময়ী। সাধক সাধনা করে দেবীর বর লাভের জন্য, দেবীর মহান আলয়ে প্রবেশ করার সুযোগ করেন বলেই এ দিনটিকে বলা হয় মহালয়া। মহালয়ার পর প্রতিপদ তিথি থেকে দেবী বন্দনা শুরু হয়।

BANGLADARSHAN.COM

মহালয়ার তিথির সময়কাল হলো অমাবস্যা। এই দিন পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করার রীতি প্রচলিত আছে।

তর্পণ মন্ত্রে বলা হয়ে থাকে, ‘যে বান্ধবা অবান্ধবা বা, যে অন্য জন্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তিং অখিলাং যান্ত, যে চ অস্মৎ তোয়কাঙ্খিণঃ।-’

অর্থাৎ বন্ধু ছিলেন কিংবা বন্ধু নন অথবা জন্মজন্মান্তরে বন্ধু ছিলেন তাঁদের জলের প্রত্যাশা তৃপ্তিলাভ করুক। মহাভারতে এই দিনটিকে পিতৃপক্ষের সমাপ্তি এবং দেবীপক্ষের সূচনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তর্পণ :

তর্পণ শব্দের ব্যুৎপত্তি হল তৃপ -অনট। তৃপ ধাতুর অর্থ তৃপ্তি সাধন করা। এখানে তৃপ্তি সাধন বলতে দেব + মনুষ্যগণের তৃপ্তিসাধনকে বোঝানো হয়েছে। সাধারণভাবে মৃত পূর্বপুরুষগণকে জলদান করাকেই -পিতৃ -ঋষি করা হয়েছে তাদের বোঝাবে। (বাৎসরিক শ্রাদ্ধ) করণতর্পণ বলা হয়। মৃত পূর্বপুরুষ শব্দে যাদের সপিণ্ডী কি্ন্তু কোনও জীবৎপিতৃক ব্যক্তি তর্পণ করতে পারবে না। আমাদের পূর্বপুরুষগণ (যার পিতা জীবিত আছে) তাদের বংশধরগণের কাছে পিণ্ড ছাড়াও জল কাঙ্খা করেন।

কারণ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে দেহের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না। তাই আমাদের পিতৃগণের দেহে যে আত্মা ছিলেন তিনি এখন যে শরীরেই অবস্থান করুন সেই শরীরেই জলক্রিয়া ও শ্রাদ্ধের দ্বারা তিনি তৃপ্তি লাভ করে থাকেন। শাস্ত্রমতে তর্পণ জলের ও শাস্ত্রীয় দ্রব্যের পরমাণু অর্থাৎ সূক্ষ্মতম কণা মন্ত্রবলে তাঁর বর্তমান দেহের ভক্ষ্য বস্তুর পর মাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকে। তাই দেবমনুষ্যগণ-পিতৃ-ঋষি-ের তর্পণ করলে তাঁরা খুশি হন ও বিনিময়ে তাঁরা আমাদের সুখ,সমৃদ্ধি, সাফল্য,পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু দান করেন।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ অনুযায়ী ‘মহালয়’- শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত উৎস মহৎ এবং আলয়। কিংবা মহত্ত্বের আলয়। এই মহালয় শব্দ থেকেই স্ত্রীবাচক পদ এসেছেমহালয়া। -

মহালয় প্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে, যে ক্ষণে পরমাত্মায় অর্থাৎ পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্তি ঘটে সেটিই হলো মহালয়। কেন না, পরমাত্মাই হলো পরব্রহ্ম। আর নিরাকার ব্রহ্মের আশ্রয়ই হলো মহালয়। তবে শ্রী শ্রী চণ্ডীতে মহালয় হচ্ছে পুজো বা উৎসবের আলয়। অর্থাৎ দেবীপক্ষ বা দুর্গাপূজার শুরুর ক্ষণ।

দেবী দুর্গা

BANGLADARSHAN.COM

******

“অয়ি দুর্গে দুর্গতিহারিণী মা চিন্ময়ী জননী,
অতসী পুষ্প বরণা আদিশক্তি সনাতনী।”

ঈশ্বরের চৈতন্যময়ী মহাশক্তি দ্বারা বিশ্বনিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ চৈতন্যময়ী মহাশক্তিই দুর্গা নামে অভিহিত। জগৎ-সৃষ্টির আদিতেও ঐ মহাশক্তি ছিল বলে তাকে আদ্যাশক্তি বলা হয়। ঈশ্বরের তিন শক্তি তিন প্রকার, যথা - শক্তিকে মহাসরস্বতী-শক্তি। জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি ইচ্ছা-জ্ঞান, ইচ্ছা-শক্তিকে মহালক্ষ্মী এবং ক্রিয়া-তে মহাকালিকা বলে এবং এই তিন শক্তির সমন্বিত রূপ হলেন দেবী দুর্গা। দুর্গ অর্থ দুর্গতি বশক্তি◌ো দুঃখ। যিনি দুর্গতি নাশ করেন তিনিই দুর্গা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছেদুর্গাসি দুর্গ ভবসাগরনৌরসঙ্গা অর্থাৎ তুমি দুর্গা -, দুর্গম ভবসাগর পারের একমাত্র নৌকা। চণ্ডী অনুসারে দুর্গম্ নামক এক অসুরকে বধ করে দেবী দুর্গা নামে খ্যাত হয়েছেন। আবার দুর্গা অর্থ দুর্জ্ঞেয়া বা অগম্য। তাই যাকে জানা দুঃসাধ্য তিনিই দুর্গা। শব্দকল্পদ্রুমে আছে “দ” অর্থ দৈত্যনাশক, “উ” কার বিঘ্ননাশক “রেফ” রোগনাশক “গ” পাপনাশক এবং “আ” কার ভয় ও শত্রুনাশক। সুতরাং যিনি দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ, ভয় এবং শত্রু হতে রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা।

দুর্গার অপর নাম চণ্ডী। চণ্ডী অর্থ কোপময়ী বা ক্রোধান্বিতা। যিনি অসুর বধের জন্য ভয়ঙ্করী ও কোপময়ী মূর্তি ধারণ করেন তিনিই দেবী চণ্ডী। দুর্গা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব এই তিন দেবতারই শক্তি। ব্রহ্মার শক্তি বলে দুর্গা

ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুর শক্তি বলে দুর্গা বৈষ্ণবী এবং শিবের শক্তি বলে দুর্গা শিবাণী নামে পরিচিতা। ভব, ভৌরব, শংকর, রুদ্র, মহাকাল, ঈশান প্রভৃতি শিবের বিভিন্ন নাম এবং দেবী দুর্গা শিবের শক্তি বলে ভবানী, ভৌরবী, শংকরী, রুদ্রানী, মহাকালী, ঈশানী নামে পরিচিতা। নারায়ণের শক্তি বলে দেবী দুর্গা নারায়ণী, ইন্দ্রের শক্তি বলে দেবী দুর্গা ইন্দ্রানী এবং বরুণের শক্তি হিসেবে দেবী দুর্গা বারুণী নামে পরিচিতা। যশ, মোক্ষ, জ্ঞান, ধন, বর প্রভৃতি দান করেন বলে দেবী দুর্গা যশোদা, মোক্ষদা, জ্ঞানদা, ধনদা, বরদা, প্রভৃতি নামে খ্যাত হয়েছেন। দুর্গা দেবীর আরেক নাম গৌরী। দেবীপুরাণ অনুসারে দেবী দুর্গা সূর্যচন্দ্রের জ্যোতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন - রূপে দুর্গা বলে তাঁর নাম গৌরী। দেবী দুর্গা ভদ্রকালী ও উগ্রচণ্ডা এই দুই বিপরীত রূপে বিরাজমান। ভদ্রকালী আমার যে মূর্তি উগ্রচণ্ডী -মঙ্গল করেন এবং উগ্রচণ্ডা রূপে তিনি বিনাশ করেন। কালিকা পুরাণে বর্ণিত আছে, আমিই আবার ভদ্রকালী, যে মূর্তিতে তোমাকে বধ করব সে মূর্তি দুর্গা নামে কীর্তিতা। ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল, কাল অর্থ সময়। সুতরাং যিনি সকল সময়ে এবং মৃত্যুকালে ভদ্র বা মঙ্গল করেন তিনিই ভদ্রকালী। যিনি উগ্র ও ভীষণ মূর্তি ধারণ করে এবং ক্রোধান্বিতা হয়ে অসুর বিনাশ করেন, তিনিই উগ্রচণ্ডা। উগ্রচণ্ডা অষ্টদশভূজা, ভদ্রকালী ষোড়শভূজা এবং দুর্গা দশভূজা।

BANGLADARSHAN.COM

নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে

॥দ্বিতীয় পর্ব॥

দেবী দুর্গার স্বরূপ:-

ধ্যানমন্ত্রটি এভাবে শুরু হচ্ছে :

“জটাজুট সমাযুক্তাম অর্ধেন্দুকৃত শেখরাম,
পূর্ণেন্দু সদৃশানোনাম সর্বাভরণভূষিতাম।”

প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রে দেবী দুর্গার যে রূপ পাওয়া যায় তা এরকম– দেবী দুর্গার জটাযুক্ত কেশে অধর্চন্দ্র শোভিত রয়েছে। দেবী দুর্গা ত্রিনয়না। তাঁর বদন পূর্ণচন্দ্রের মত এবং দেহের বর্ণ অতসীফুলের মত হলুদাভ। দুর্গা ত্রিলোকে সুপ্রতিষ্ঠিতা, নবযৌবনসম্পন্না-, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা, সুন্দর ও সমুন্নত বক্ষবিশিষ্টা এবং সুচারুদর্শনা। তাঁর বামজানু, কটি ও গ্রীবা এই তিন স্থান কিঞ্চিৎ ত্রিভঙ্গভাবে স্থাপিত। দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী সমন্বিতা। দু তুল্য দশবাহু (পদ্মের বৃন্ত) এবং পদ্মের মৃণাল (মহিষাসুরকে যিনি মর্দন বা দলন করেন)র্গার ডান দিকের পঞ্চহস্তে ঊর্ধ হতে অধঃক্রমে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণ বাণ ও শক্তি রয়ছে এবং বাম দিকের পঞ্চহস্তে ঊর্ধ হতে অধঃক্রমে খেটক (ঢাল), ধনু, পাশ, অঙ্কুশ ও ঘণ্টা বা কুঠার রয়েছে। দেবী দুর্গার পদতলে ছিন্ন-কে উদ্ভূত হয়মস্তক মহিষ এবং মহিষের স্কন্দদেশ থে◌েছে খড়্গধারী এক দানব। দেবী দুর্গা শূল দ্বারা ঐ দৈত্যের বক্ষ বিদীর্ণ করেছেন। ফলে দৈত্যের শিরাসমূহ বিনির্গত এবং তার অঙ্গ রক্তাক্ত ও চক্ষু দুটি ক্রোধে রক্তিম হয়েছে। দেবী দুর্গা নাগপাশযুক্ত হস্ত দ্বারা অসুরের কেশাগ্র ধরেছেন। নাগপাশ বেষ্টিত হওয়াতে অসুরের মুখ দিয়ে রক্ত বহির্গত হয়ে উঠেছে। দেবী দুর্গার দক্ষিণ চরণ সিংহপৃষ্ঠে এবং বাম চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি অসুরের স্কন্ধ দেশে স্থাপিত। দেবী দুর্গা উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা এই অষ্টশক্তি পরিবেষ্টিতা। দেবী দুর্গা 'ধর্মকামার্থমোক্ষদামধর্ম - ", অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল দান করে জগৎকে ধারণ করে আছেন।

বেদে দুর্গা:-

বেদে দুর্গা বাক্ দেবী নামে পরিচিতা। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সংখ্যক সূক্তকে দেবীসূক্ত বলে। বেদের - আমি রূদ্র ও বসু রূপে বিচরণ করি। -সূক্তে দেবী বলেছেন-দেবীআমি আদিত্য ও বিশ্বদেব রূপে বিচরণ করি। আমি মিত্রাবরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিদ্বয়কে ধারণ করি। আমি শত্রুনাশক সোমকে ধরে আছি, আমি ত্বষ্টা, পূষা ও ভগদেবকে ধারণ করি। যে যজমানের প্রচুর হবি আছে ও যা তিনি দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করেন ও যিনি বিধিমত সোমরস প্রদান করেন তাঁকে আমি যজ্ঞের ফল দান করি। আমি রাষ্ট্রী, রাষ্ট্রের অধীশ্বরী।

রাজ্য রক্ষার্থ যে সম্পদের প্রয়োজন আমি তার বিধানকর্তা। সংসারে শান্তিলাভের জন্য যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রয়োজন, আমি তাই জানি। আম এক হয়েও বহুরূপা। সর্বজীবে আমি বহুরূপে প্রবিষ্ট হয়ে আছি। দৈবী সম্পদশালী দেবতাগণ যা সাধন করেন সকলই আমার উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয়। যে অন্ন ভোজন করে, যে দর্শন করে, যে প্রাণ ধারণ করে, যে বাক্য শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি আমা দ্বারাই ঐ সকল কর্ম সাধন করে থাকে। আমার এই সরূপতত্ত্ব যারা জানে না তারা হীনদশা প্রাপ্ত হয়। শোনো হে যশস্বী বন্ধু, বহু সাধনালব্ধ যে বার্তা তা তোমাকে বলছি। আমি নিজে সে কথা বলছি, যা দেবগণ ও মনুষ্যগণ সকলে জানার জন্য যত্নপরায়ণ। যে যেমন বাসনা করে তাকে তেমনটি আমিই করে থাকি। ব্রহ্মাও আমার সৃষ্টি; ঋষিও আমার সৃষ্টি এবং জ্ঞানীও আমার সৃষ্টি। আমি রূদ্রের ধনুকে জাযুক্ত করে বিস্তার করি-, যারা ব্রহ্মাদ্বেষী তাদের নাশের জন্য এবং সজ্জনের রক্ষার্থ আমি যুদ্ধ করি। স্বর্গমর্ত্যের সর্বত্র আমি সংপ্রবিষ্ট হয়ে আছি-, সর্বোপরি যে জগতের পিতা তাঁকেও আমি প্রবসব করেছি। পরম জ্ঞানঅভ্যন্তরে আমার যোনিস্থান। সর্বভূবনে আমি অনুপ্রবিষ্ট। ভূলোকের ঊর্ধে য সমুদ্রের-ে দ্যুলোক আছে, তাও স্থির আছে আমি স্পর্শ করে আছি বলে। ভূলোক, ভূবলোকাদি নিখিলবিশ্ব সৃষ্টি করতে - দ্যুলোক সকলের ঊর্ধে। আমি -করতে আমি তার উপর বায়ুর মত প্রবাহিত হই। মূলত আমি ভূলোক তীত তথাপি নিজ মহিমায় জগন্ময়ী এই বিশ্বরূপধারিণী হয়ে আছি।সর্বতোভাবে বিশ্বা

উপনিষদে দুর্গা:-

কেন উপনিষদে দেবী দুর্গার পরিচয় পাওয়া যায় হৈমবতী উমা নামে? হৈমবতী উমার আবির্ভাবের কাহিনীটি এরকম এককালে দেবতারা তাঁদের শক্তি নিয়ে গর্ববোধ করতে লাগলেন। সর্বশক্তিমান ব্রহ্মা দেবতাদের - দর্পচূর্ণ করার জন্য যক্ষ রূপে তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। যক্ষরূপী ব্রহ্মা তাঁদের সম্মুখে একটি তৃণ রাখলেন এবং তাঁদের শক্তি প্রয়োগ করতে বললেন। দেবতারা ঐ তৃণকে তুচ্ছজ্ঞান করতে লাগলেন। কিন্তু বায়ু শতচেষ্টার পরেও তৃণকে নড়াতে পাররেন না-, অগ্নি শতণকে পোড়াতে পারলে না। তারপর চেষ্টার পরও তৃ- ইন্দ্র তৃণের উপর শক্তি প্রয়োগ করতে গেলে যক্ষরূপী ব্রহ্মা অদৃশ্য হন। তখন হৈমবতী উমা ইন্দ্রাদি দেবতার সম্মুখে দৃশ্যমান হয়ে বললেন যেঐ যক্ষই ব্রহ্ম। এখন উমা শব্দটি বিশেস্নষণ করা যাক। উমা - শব্দটির‘‘উ’’ দ্বারা গমন এবং ‘‘মা’’ দ্বারা দীপ্তি বা আলোক বোঝায়। সুতরাং উমা অর্থ গতিশীল আলোক অর্থাৎ উপনিষদের উমা জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যা যিনি ব্রহ্মকে প্রকাশ করেন। তবে উমা শব্দের পৌরাণিক অর্থ ভিন্ন। কালিকা পুরাণ মতে হিমালয় কন্যা পার্বতী কঠোর তপস্যায় রত হলে মা মেনকা বলেনঅর্থাৎ হে) উ - (কন্যা, মা মেনকা কর্তৃক তপস্যায় নিষিদ্ধা হয়ে পার্বতীর নাম হল ।(র্থাৎ তপস্যা কর নাঅ) উমা ও সোমা।

দেবী দুর্গার মূর্তির সূক্ষ্ম তাৎপর্য:-

শক্তি নিরাকার এবং অদৃশ্যমান। তবে মহাশক্তি দুর্গার সাকার রূপ কেন? দেবী দুর্গার সাকার রূপের একটি সূক্ষ্ম অর্থ আছে। শুভ্র বা উজ্জ্বল বর্ণ সত্ত্বগুণ, লাল বর্ণ রজোগুণ এবং কাল বর্ণ তমোগুণকে নির্দেশ করে।

দেবীর বর্ণ উজ্জ্বল এর অর্থ দেবী দুর্গা সত্ত্বগুণ সম্পন্না।

দেবী দুর্গা দশহস্তে দশ প্রহরণ এই ধারণ করেছেন এবং বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিতা হয়েছেন। দেবীর (অস্ত্র) রকম বেশ রজোগুণকে নির্দেশ করে।

আবার দেবী দুর্গা ক্রোধান্বিতা হয়ে অসুরকে শূলবিদ্ধ করে বধ করেছেন। দেবী দুর্গার এ ভাবটি তমোগুণকে নির্দেশ করে।

তাই দেবী দুর্গা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এবং এই ভাবটি বোঝাতেই দেবী দুর্গার এরকম রূপের কল্পনা করা হয়েছে।

দুর্গা শক্তি বা প্রকৃতিকে নারী জ্ঞান করা হয় কেন? নারী দ্বারাই স্থাবর ও জঙ্গম সব কিছু সৃষ্টি হয়। নারী সৃষ্টির প্রতীক। পরব্রহ্মের শক্তি বা প্রকৃতিকে নারী রূপে কল্পনা করা হয়। এজন্য চৈতন্যময়ী মহাশক্তি দুর্গাকে নারী রূপে কল্পনা করে নারীর বসনসজ্জিতা করা হয়েছে। ভূষণে-

দেবী দুর্গার দশ হাত দশ দিক নির্দেশ করে। দেবী দুর্গা দশ দিকব্যাপী অর্থাৎ দেবী দুর্গা সর্বত্র বিরাজমানা এবং দশ হাতের দশ অস্ত্র দ্বারা দশ দিকের অসুরদের বিনাশ করে ভক্তের মঙ্গল করেন।

দেবী সিংহের উপর দাড়িয়ে অসুর নিধন করছেন। সিংহ শব্দটির অর্থ যে হিংসা করে। হিংসা যেহেতু রজোগুণের কার্য সেহেতু সিংহ রজোগুণের প্রতীক। অসুর তমোগুণের প্রতীক। সিংহ অসুরকে বিবশ করছে আবার দেবী সিংহকে শাসন করছেন, এর অর্থ এই যে রজঃ তমোকে নাশ করে এবং সত্ত্ব রজঃকে নাশ -করে। রজঃ দ্বারা তমোকে এবং সত্ত্ব দ্বারা রজোকে নাশ করে সত্ত্বগুণে উন্নীত হওয়ার নাম সাধনা। তবে সাধনার উচ্চ স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য ত্রিগুণাতীত হওয়া আবশ্যক।

দেবী দুর্গা ত্রম্বকা অর্থাৎ দেবী দুর্গার তিনটি অম্বক বা চক্ষু রয়েছে। দেবী দুর্গার তিন চক্ষু দ্বারা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল বোঝায়। তিনটি অম্বকের অধিকারিণী বলে দেবী দুর্গাকে অম্বিকাও বলা হয়।

সামনের ৩০শে সেপ্টেম্বর পঞ্চমী তিথির অধিবাসের মধ্য দিয়ে দেবী পূজার সূচনা হবে। মা কৈলাশ ছেড়ে তাঁর সন্তানদের নিয়ে আসবেন পিতৃলোকে। অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তি প্রতিষ্ঠায় মর্ত্যে আসবেন দেবী দুর্গা।

১লা অক্টোবর ষষ্ঠী তিথিতে অশ্বমেধ বৃক্ষের পূজার মাধ্যমে আবাহন করা হবে দেবী দুর্গার। ঢাকঢোল আর -কাঁসর বাদ্যে দেবীর বোধন পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হবে দুর্গাপূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা। এইদিনই হবে দেবীর বোধন পূজা।

২রা অক্টোবর সপ্তমী তিথিতে দেবীর নবপত্রিকা স্থাপন সপ্তম্যাদি কল্পারম্ভের মধ্যদিয়ে হবে মহা সপ্তমী পূজা। এই নব পত্রিকাই 'কলাবউ' নামে পরিচিত। নবপত্রিকাকে সিদ্ধিদাতা গণেশের পাশে অধিষ্ঠিত করা হবে। এই দিনই দেবীর মৃন্ময়ীতে প্রাণ সঞ্চার করা হয়।

পরদিন ৩রা অক্টোবর মহা অষ্টমী তিথিতে সনাতনী নারীপুরুষ-, শিশুবৃদ্ধ সকলে মিলে দেবীকে -শোরকি-পুষ্পাঞ্জলি দেয়া হবে। এইদিনই হবে সন্ধিপূজা। সন্ধিপুজো মানে চামুন্ডামাতার পুজো, অসুরনাশিনী, অশুভ অমঙ্গল নাশ করে এই আটচল্লিশ মিনিটে মা তনয়ের সব মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন।অষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট ও নবমী তিথির শুরুর ২৪ মিনিট নিয়ে হয় সন্ধিপুজো। দুই তিথির সন্ধিক্ষণের এই সময়েই চন্ড ও মুন্ডকে বধ করেছিলেন দেবী দুর্গা।

মাতৃরূপে কুমারী কন্যাকে জীবন্ত প্রতিমা কল্পনা করে জগজ্জননীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে হবে 'কুমারী পূজা'। শাস্ত্রমতে, এদিন পূজিত কুমারী কন্যার নামকরণ করা হয় 'উমা'।

৪ঠা অক্টোবর নবমীতে মণ্ডপে মণ্ডপে দেবীর মহা প্রসাদ বিতরণ করা হবে।

সর্বশেষ ৫ই অক্টোবর দশমী তিথিতে দর্পণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে বিদায় জানানো হবে দেবী দুর্গাকে। বিসর্জন হবে মৃন্ময়ী মূর্তির, কিন্তু চিন্ময়ী দেবীর চৈতন্যময় প্রকাশ সদা বিরাজিত থাকে জগতে কারণ তিনি যে স্বয়ং জগৎজননী।

নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে

॥তৃতীয় পর্ব॥

দুর্গা আখ্যান:-

শ্রীশ্রীচন্ডীতে বর্ণিত উপাখ্যান অনুযায়ী,পুরাকালে সুরথ নামক একজন রাজা শত্রুর নিকট পরাজিত হয়ে মনের দুঃখে বনে গমন করেন। ক্রমে তিনি মেধা মুনির আশ্রমে অবস্থান করেন। ধনলোভে স্ত্রী ও পুত্রগণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ধনবান সমাধি নামক এক বৈশ্য তথায় উপস্থিত হন। রাজ্য হারা রাজা সুরথ ও পরিবার পরিত্যক্ত বৈশ্য সমাধি মিলিত হলেন। তাঁরা একে অপরের সমস্যা অবগত হলেন। যে ধনলোভী আত্মীয় ও স্ত্রীপুত্রগণ তাঁদের পরিত্যাগ করেছে, তাদের জন্যই উভয়ের চিত্ত স্নেহাসক্ত হচ্ছে, তাদের কুশলাকুশল নিয়ে তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

এই মায়ারহস্য সম্বন্ধে অবগত হতে তাঁরা উভয়ে মেধা মুনির সমীপে উপস্থিত হন, মুনিকে প্রশ্ন করেন। মেধা মুনি মহামায়ার স্বরূপ বর্ণনা করেন এবং বহু অবতারের মধ্যে মায়ের তিনটি অবতারের বিবরণ দেন - মধুকৈটভ বধ, শুম্ভ নিশুম্ভ বধ ও মহিষাসুর বধ--মায়ের তিনটি অবতারের তিনটি কাজ।

মধুকৈটভ বধ - দুই দৈত্য মধু ও কৈটভ, এই দুজন দৈত্যের একত্রিত নাম হলো- মধুকৈটভ। মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে- প্রলয়সমুদ্রে বিষ্ণু যখন অনন্তনাগের উপ-র যোগ নিদ্রায় ছিলেন, তখন তাঁর নাভি থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। এই সময় বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে দুটি দৈত্য জন্মলাভ করেন। এই দৈত্য দুটির নাম ছিল মধু ও কৈটভ। দৈত্যরা জন্ম নিয়েই ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে- ইনি যোগনিদ্রারূপী মহামায়ার বন্দনা করেন কারণ বিষ্ণু যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিলেন । মহামায়া বিষ্ণুর দেহের থেকে নিদ্রাকে অন্তর্হিত করেন এবং ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হয়ে নিজেকে ব্রহ্মার সামনে প্রকাশ করেন। পরে ব্রহ্মাকে অভয় দান করে অন্তর্হিত হলে - বিষ্ণু নিদ্রা থেকে জেগে উঠে দৈত্যদের আক্রমণ করেন। এরপর বিষ্ণু এদের সাথে পাঁচ হাজার বছর যুদ্ধ করেন। কারণ এই দৈত্যরা মহামায়ার দ্বারা অনুগ্রহভাজিত ছিল। ফলে শেষ পযর্ন্ত যুদ্ধে কোন পক্ষই জয়লাভ করতে সক্ষম হলো না। তখন মহামায়া এদের সম্মোহিত করে ফেলেন। এরপর দৈত্যরা বিষ্ণুর যুদ্ধে সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণুকে বর দিতে ইচ্ছা করেন। বিষ্ণু বলেন যে- লোক হিতার্থে তোমরা আমার বধ্য হও। দৈত্যরা বিষ্ণুকে বলেন যে- তুমি আমাদেরকে জলহীনস্থানে হত্যা কর। এরপর বিষ্ণু তাঁর হাটুর উপর উভয় দৈত্যকে রেখে সুদর্শন চক্র দ্বারা তাঁদের শিরোশ্ছেদ করেন। পরে এই দুই দৈত্যের দেহের মেদ থেকেই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে বলে- হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী মতে পৃথিবীর অপর নাম মেদিনী।

শুম্ভ নিশুম্ভ বধ চনা। এই দুই ভাই দেবীমাহাত্ম্যম্ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় থেকে শুম্ভ ও নিশুম্ভের কাহিনির সূ - ত্রিলোক অধিকার করার বাসনায় কঠোর তপস্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। তারা পুষ্কর নামে এক পবিত্র ক্ষেত্রে গিয়ে এক হাজারবছর তপস্যা করেন। তাদের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাদের বর দেন যে দেব, দানব কিংবা মানুষ, কেউই তাদের পরাস্ত করতে পারবে না।এরপর দুই ভাই স্বর্গ জয় করে দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেন। দেবতারা দুর্গার শরণাপন্ন হলেন দুর্গা তাদের সহায়তা করতে সম্মত হন।

এদিকে শুম্ভের অনুচর চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুই অসুর পথে দেবীকে দেখতে পান। দেবীর রূপে মোহিত হয়ে তারা শুম্ভের নিকট গিয়ে দেবীর আগমনের বার্তা দেন। শুম্ভ বানর সুগ্রীবকে দেবীর নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু দেবী তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। অসুর ভ্রাতৃদ্বয় স্থির করেন, দেবী স্বেচ্ছায় তাদের নিকট আসতে না চাইলে, তারা দেবীকে হরণ করে আনবেন। তারা ধূম্রলোচন নামক অসুরের অধীনে ষাট হাজার সেনা প্রেরণ করেন দেবীকে হরণ করার জন্য। কিন্তু দেবী ও তার বাহন সিংহ সমগ্র বাহিনীকে ধ্বংস করেদেন। এরপর চণ্ড ও মুণ্ডকে প্রেরণ করা হলে, দেবী তাদেরও হত্যা করেন।শুম্ভ ও নিশুম্ভ হলেন ঔদ্ধত্য ও অহংকারের প্রতীক, যাঁরা দেবীর বিনয় ও প্রজ্ঞার নিকট পরাস্ত হন।

মহিষাসুর বধ পুরাণ মতে-, ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর অমর হয়ে উঠেছিলেন। কোনো পুরুষ তাকে বধ করতে পারবে না। শুধুমাত্র কোনো এক নারীশক্তির কাছেই তার পরাজয় নিশ্চিত। বর পেয়ে স্বর্গ দখল নেয় অসুর রাজা মহিষাসুর। অসুরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে স্বর্গপাতাল। তখন ত্রিশক্তি ব্রহ্মা-মর্ত্য-, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শক্তি দিয়ে ঘুম ভাঙানো হয় আদিশক্তি মহামায়ার। দেবতাদের অস্ত্রে সজ্জিত করা হয় দেবীকে। বাহন সিংহে চেপে দেবী যান অসুর বধে। রম্ভাসুর, তারকাসুর একে একে বধ করেন সকলকে।মহিষাসুরকে বধের মধ্য দিয়ে ত্রিলোকের শান্তি ফিরিয়ে আনেন দেবী দুর্গা।

দেবী মাহাত্ম্য শ্রবণ করে মেধা মুনির উপদেশে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য দেবীর আরাধনার জন্য গমন করেন। নদীতীরে অবস্থান করে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ দেবীসূক্তপাঠ ও তার ভাবার্থ অনুধ্যান করতে করতে তপস্যারত হন। তাঁরা উভয়ে নদীতটে দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করে সংযতচিত্তে পূজা আরাধনা করেন। তিন বছর এরূপে দেবীর আরাধনার ফলে জগদম্বা চণ্ডিকা সন্তুষ্টা হলেন। দেবী প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূতা হয়ে বললেন যে, সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য দেবীর নিকট যা যা প্রার্থনা করছেন তা তারা পাবেন। দেবী তা তাদের প্রদান করবেন। স্ব স্ব প্রার্থনা অনুযায়ী, সুরথ রাজা তার হারানো রাজ্য ফিরে পাবেন ও মৃত্যুর পর সাবর্ণি নামে অষ্টম মনু হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন–এই বর এবং সমাধি বৈশ্যকে মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য তত্ত্বজ্ঞানরূপ বর প্রদান করে দেবী অন্তর্হিতা হন।

দেবীর সেই মহিষাসুর বধের দৃশ্যই কল্পনা করে তখন থেকে মর্ত্য অর্থাৎ আমাদের মানবকূলে দেবী দুর্গার পূজা শুরু হয়। কোনো কোনো মন্দিরের পুরোহিতদের মতে, এবছর উমা'র আগমন গজে এবং ফিরে যাবেন

নৌকায়। মায়ের গজে আগমনের ফলশ্রুতি হচ্ছে শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা। আর নৌকায় গমনের ফলশ্রুতি শস্যবৃদ্ধি এবং জলবৃদ্ধি। এ বছর দেশের অনেক স্থান বন্যাজলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়েছে-, অনেক শস্যাদি নষ্ট হয়েছে। তারই একটা প্রভাব আসছে।

দুর্গাতত্ত্ব:-

“নমো নারায়ণী তুমি বিশ্বমাতা,
শান্তিরূপিণী মাগো শক্তিদাতা।
তুমি ঈশ্বরী মা সারা বিশ্বমনে,
জাগো সৃষ্টি স্থিতি লয় ধ্যান জ্ঞানে,
জগচিত্ত জুড়ে তব আসনপাতা।”

বেদান্তে সংক্ষেপে বলা হয়, সকল মানুষের লক্ষ্য সকল দুঃখের চিরতরে বিনাশ এবং পরম আনন্দ পাওয়া। নিরাকার পরমেশ্বর এক হয়েও তাঁর মহামায়া শক্তিকে অবলম্বন করে সৃষ্টি প্রলয়-স্থিতি-ক্রিয়ায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামরূপ ধারণ করেন।-

শক্তি ছাড়া ক্রিয়া সম্ভব নয়। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে আছেএই মহামায়াই বিষ্ণুর পালনী শক্তি বৈষ্ণবী :, শিবের ধ্বংস শক্তি শিবানী এবং ব্রহ্মার সৃষ্টি শক্তি ব্রহ্মানী। মহামায়ার শরণাপন্ন হলে সকলের দুঃখ তিনি দূর করেন। ভক্তরা প্রার্থনা করেনহে মা :, তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ করো। আমাদের আয়ু, আরোগ্য, ধন দাও। মাটির প্রতিমায় এবং বিল্ববৃক্ষ আবাহন করছি। অচঞ্চলা লক্ষ্মী হয়ে আমাদের ঘরে অবস্থান করে ইচ্ছা পূরণ করো।

শ্রীশ্রী চণ্ডীর উৎপত্তি মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দ -েবী চণ্ডীর উৎপত্তির কাহিনী এরকম– পুরাকালে একশত বছর ধরে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। তখন অসুরদের অধিপতি ছিল মহিষাসুর। মহিষাসুর দেবতাদের যুদ্ধে পরাজিত করে এবং দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে স্বর্গের অধিপতি হয়। অগত্যা দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করে শিব ও বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হন।

দেবতাদের মুখে মহিষাসুরের স্বর্গরাজ্য অধিকারের বণর্না শুনে ভগবান শিব ও বিষ্ণু ক্রোধান্বিত হলেন এবং ভ্রুকুটিতে তাঁদের বদন কুটিল হল। তখন ক্রোধান্বিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের বদন হতে জ্যোতি বা তেজঃ নির্গত হল। ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতার দেহ হতেও অতি প্রবল তেজঃ নির্গত হতে থাকল। তারপর সে তেজোপুঞ্জ একত্র হয়ে জ্যোতি দ্বারা ত্রিভুবন পরিপূর্ণ করে এক নারীতে পরিণত হল।

শিবের তেজে সে নারীর মুখ, যমের তেজে কেশ, বিষ্ণুর তেজে বাহুগুলো, চন্দ্রের তেজে স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে চরণদ্বয়, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতির তেজে দন্তসমূহ, অগ্নির তেজে নয়ন তিনটি, সন্ধ্যাদেবীদ্বয়ের প্রাতঃ ও) সায়ং (সন্ধ্যা-তেজে ভ্রুদ্বয় এবং পবনের তেজে কর্ণদ্বয় গঠিত হল। সুতরাং দেবী চণ্ডী হলেন সর্বদেবদেবীর সমন্বিত শক্তি। দেবীকে দেখে সকল দেবতারা আনন্দিত হলেন।

মহাদেব নিজ শূল হতে একটি শূল উৎপন্ন করে দেবী চণ্ডীকে উপহার দিলেন। তারপর বিষ্ণু দেবীকে চক্র, বরুণ শঙ্খ, অগ্নি শক্তিঅস্ত্র-, পবন ধনু ও বাণপূর্ণ দুটি তুণীর, ইন্দ্র বজ্র ও ঐরাবত হস্তীর গলার ঘণ্টা, যম দণ্ড, জলাধিপতি পাশ, প্রজাপতি অক্ষমালা (জপমালা), ব্রহ্মা কমণ্ডলু, সূর্য কিরণমালা, কাল খড়্গ ও চর্ম (ঢাল), ক্ষীর সমুদ্র নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কার, বিশ্বকর্মা কুঠার ও বর্ম, জলধি পদ্মমালা ও একটি মনোরম পদ্ম, কুবের সুরাপূর্ণ পানপাত্র এবং পৃথিবী অনন্ত নাগ উপহার দিলেন।

দেবী বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হয়ে অট্টহাস্য সহকারে উচ্চনাদ করতে লাগলেন। ঐ উচ্চনাদের প্রতিধ্বনিতে স্বর্গ-পাতাল কম্পিত হতে লাগল। দেবগণ আনন্দে দেবীর জয়ধ্বনি করলেন। সেজন্য দেবীর নাম হল জয়া।-মর্ত্য

BANGL

“তব কোদন্ড টঙ্কারে শিহরে ধরাতল,
পদতলে মূর্ছিত সহস্র শতদল,
চকিত চঞ্চল হাসিয়া খলখল
মাতিয়া উঠিলে মাগো একী রণ রঙ্গে॥”

পুরাণ মতে ঋষি কাত্যায়ণের আশ্রমে দেবগণের তেজ মিলিত হয়ে দেবীর উৎপত্তি হয়েছিল বলে দেবীর কাত্যায়ণী নামে পরিচিতা হলেন। তাই দেবীকে স্তব করে বলা হয় :

তুমি বেদ পুরাণ, তুমি নিত্য নব
মোরা শরণাগত দীন তনয় তব।
তুমি কাণ্ডারি মা ভবসাগর মাঝে,
সুখে দুঃখে তব অভয় বাজে
কভু নারায়ণী, কভু অগ্নিবীতা।

ধর্মীয় তিনটি দিন-দর্শন, পুরাণ ও অনুষ্ঠান:-

প্রত্যেক ধর্মেরই তিনটি দিক আছে। সেগুলো হলোদর্শন :, পুরান ও অনুষ্ঠান। দর্শন হলো তত্ত্ব বা রহস্য। সেই রহস্যকে পৌরাণিক কাহিনির মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয়। আর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শন বা তত্ত্ব পায় ব্যবহারিক রূপ।

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে আছে–স্বর্গ দেবতাদের ভোগের জায়গা। পুণ্য কর্ম করে দেবতারা স্বর্গরাজ্য পেয়েছেন। যুদ্ধে দেবতাদের হটিয়ে স্বর্গরাজ্য অধিকার করে নিল মহিষাসুর। দেবতারাও অসহায় হয়ে মানুষের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। দেবতারা ব্রহ্মাকে জানালেন দুঃখের কথা। ব্রহ্মা দেবতাদের নিয়ে শিব ও বিষ্ণুর কাছে গেলেন। দেবগণ মহিষাসুরের দৌরাত্ম্য ও তাদের পরাজয়ের কাহিনি বর্ণনা করলেন শিব ও বিষ্ণুর কাছেসূর্য :, ইন্দ্র, বায়ু, যম, বরুণ ও অন্যান্য দেবতাদের সুখভোগ করার অধিকার মহিষাসুর হরণ করেছে। শুনে বিষ্ণু ও শিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের বদন থেকে এবং পরে অন্য দেবগণের শরীর থেকে বিপুল তেজ নির্গত হয়ে এক নারীর দেহে রূপান্তরিত হলো, তাই তিনি অমৃতজ্যোতি স্বরূপা, জ্যোতির্বলয় ঘেরা মায়ের চিন্ময়ী দেহ। এই শরীর অবলম্বন করে জগজ্জননী মহামায়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গারূপে আবির্ভূত হলেন।

“হে অমৃতস্বরূপিণী কাঞ্চনবরণী দেবী
দামিনী জ্বলে তব অঙ্গে,
আশেপাশে ধারিণী, মত্ত বিলাসীনী
কাঁপে মরু পর্বত তব গুরু ভঙ্গে।”

নিজেদের অস্ত্র থেকে বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে দেবীকে সকলে সাজালেন। গিরিরাজ হিমালয় দিলেন তাঁর বাহন সিংহ। এই দেবী সকল অসুর অনুচরসহ মহিষাসুরকে বধ করে দেবতাদের স্বর্গরাজ্য ফিরিয়ে দিলেন।

প্রাচীনকালে নন্দরাজার গৃহে যশোদার গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করে বিন্ধ্য পর্বতে অবস্থান করে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে হত্যা করার সংকল্পও করেছিলেন।

জগজ্জননী মহামায়া দুর্গাই বিভিন্ন রূপ ধরে রয়েছেন। শ্রীশ্রী চণ্ডী গ্রন্থে বর্ণনা আছে, সকলের মাঝে তিনি মা হয়ে, সমস্ত প্রাণীর ক্ষুধা হয়ে, পুণ্যবানের ঘরে লক্ষ্মী হয়ে, আর পাপীদের ঘরে অলক্ষ্মী হয়ে আছেন। মানুষ মাত্রই ভুল করে, এই ভ্রান্তিরূপেও তিনি সকলের মধ্যে রয়েছেন। শাক মানে শস্য। সেই শস্য হয়ে তিনিই আছেন পৃথিবীতে। এ জন্য তাঁর এক নাম ‘শাকম্ভরী’। শস্যসম্পদ হয়ে আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করে আমাদের ক্ষুধারূপ দুর্গতি নাশ করে হয়েছেন দুর্গা। এ জন্যই দুর্গাপূজায় নয়টি শস্য দিয়ে তৈরি হয় দুর্গা দেবীর আর এক রূপ ‘নবপত্রিকা’।

মায়ের স্বরূপ অনুভব করেন ঋষিগণ ধ্যানে। সেই ধ্যান অনুসারেই প্রতিমা তৈরি হয়। বাবার ফটোগ্রাফ দেখলে যেমন বাবাকেই মনে পড়ে, সে রকম প্রতিমা দেখলে তাঁকেই মনে পড়বে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, গৃহস্থের ভক্তি আর প্রতিমা সুন্দর হলে এবং পূজারির ভক্তি থাকলেই প্রতিমায় তাঁর আবির্ভাব হয়। ভক্তিতেই ভক্তগণ মায়ের মহিমা অনুভব করে থাকেন।

সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাও মহামায়ার স্তব করেছিলেন :'আপনি বেদের মাতা গায়ত্রীরূপা, দেবগণের আদি মাতা। আপনি এই জগৎ ধারণ করে রয়েছেন, আপনি জগদ্ধাত্রী। আপনিই সৃষ্টিশক্তি, পালনশক্তি ও সংহার শক্তিরূপে বিরাজ করেন। আপনার স্তব কে করতে পারেআপনি কৃপা করে বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা থেকে জাগিয়ে এবং তাঁর ! মনে অসুর মধু ও কৈটভকে সংহার করতে ইচ্ছা জাগিয়ে তুলুন।' মহামায়া তা-ই করলেন। বিষ্ণু মধু ও কৈটভকে বধ করলেন। সৃষ্টি রক্ষা হলো।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, 'সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মায়ায় আমি আবৃত থাকি বলে সকলের কাছে প্রকাশিত হই না। কেবল কোনো কোনো ভক্তের কাছে আমি প্রকাশিত হই। তাই এই মোহে অন্ধ জগতের মানুষ জন্ম-।(২৫ / ৭-গীতা) মৃত্যুশূন্য আমার স্বরূপ জানতে পারে না' উপমায় বলা হয়েছে, সামনে রাম পরমাত্মা, পেছনে লক্ষ্মণ জীবাত্মা, আর মাঝে মহামায়া সীতা। সীতা একটু সরে না গেলে লক্ষ্মণ রূপ জীব রামরূপ পরমাত্মাকে দেখতে পায় না। ভগবান যে মায়ার কথা বলেছেন, তার স্বরূপ ও প্রভাব জানতে পারলে আমরা তাঁকে প্রসন্ন করে মুক্ত হতে পারি, মহামায়ার কৃপায় ঈশ্বর লাভ করে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারি।

দুর্গাপূজায় দেবীর প্রণাম মন্ত্রে বলা হয়:

'জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা মা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোস্তুতে।'
তিনি সর্বোৎকৃষ্টা বলে তাঁকে বলা হয় 'জয়ন্তী।'
তিনি জন্মমৃত্যু বিনাশিনী-, তাই তিনি 'মঙ্গলা।'
প্রলয়কালে সমগ্র জগৎকে গ্রাস করেন বলে তিনি 'কালী।'
তিনিই সুখদান করেন, এ জন্য 'ভদ্রকালী।'

সৃষ্টির কারণকে রক্ষা করেন বলে তিনি 'কপালিনী'। অনেক দুঃখের হরণ করেন এবং দুর্গতি নাশকালে তাঁকে পাওয়া যায়, এ জন্য তিনি 'দুর্গা'।

তিনি চৈতন্যস্বরূপিণী, তাই 'শিবা'।
করুণাময়ী বলে তাঁর নাম 'মা'।

বিশ্বধারণ করে থাকেন বলে ‘ধাত্রী’।
দেবগণের পোষণকারিণী বলে তিনি ‘স্বাহা’

এবং পিতৃলোক পোষণকারিণী বলে তিনি ‘স্বধা’। চরাচরের সর্বত্রই তিনি।

দুর্গাপূজার ঐতিহ্যও আছে। রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য দুর্গতিনাশিনী দুর্গার আরাধনা করেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়ের জন্যে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন দুর্গার স্তব করলেন :‘নমস্তে বিশ্বসেনানী আর্যে মন্দারবাসিনি...’ ইত্যাদি। মার্কন্ডেয় মুনির পরামর্শে এই পূজা করেই সুরথ রাজা তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন। আবার সমাধি বৈশ্য সমস্ত মোহ ও মমতার সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হলেন। এটাও ঐতিহ্য। প্রাচীনকালে যেমন সত্য ছিল, বর্তমান কালেও তাই। বর্তমানেও মানুষ ধনপুত্র-, যশ, রূপ, জয় ইত্যাদি লাভের জন্য দুর্গাপূজা করে থাকেন। ভক্তি ও মুক্তিলাভের জন্যও করেন। দুর্গাপূজায় ভক্ত অনুভব করেন, আমরা সকলে একই মায়ের সন্তান। সকলেই আমরা আপন। সকলের মধ্যে সম্প্রীতি দুর্গাপূজার এক বিশেষ দিক।

আমরাও দুর্গা দেবীকে প্রণাম জানাই। হে দেবী, আপনি সকলের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে বিরাজ করেন। আপনিই নারায়ণী, স্বর্গ বা ভোগ এবং অপবর্গ বা মুক্তি দান করেন। আপনি সকল মঙ্গলস্বরূপা, সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণকারিণী, একমাত্র আশ্রয়রূপা, সূর্যঅগ্নি আপনার তিন নয়ন-চন্দ্র-, আপনি গৌরীবর্ণা। আপনাকে প্রণাম।

দেবী দুর্গাতত্ত্ব শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে,

“নমো নমো মা দুর্গা নমো নারায়ণী...
কখনও বা পুরুষ হও কখনও রমণী।
রাম রূপে ধর ধনু মা কৃষ্ণরূপে বাঁশি,
ভুলালি শিবের মন হয়ে এলোকেশী”।

আবার সাধক কমলাকান্তের ভাষায় :

জান না রে মন পরম কারণ শ্যামা মা সামান্য মেয়ে নয়,
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখনো কখনো পুরুষ হয়।
হয়ে এলোকেশী করে ধরে অসি,
দনুজ তনয়ে করে সভয়,
কভু ব্রজপুরে আসি বাজাইয়া বাঁশি
ব্রজাঙ্গনার মন হরয়ে লয়।

শাস্ত্রে শ্রীশ্রী দুর্গাদেবীর অনেক নামের মধ্যে মহাশক্তি, ব্রহ্মময়ী, আদ্যাশক্তি, নারায়ণী, চণ্ডী, মহিষমর্দিনী-, অসুর নাশিনীএই সকল নাম বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। এই নামগুলির প্রত্যেকটি অর্থের মাঝে একটি - দর্শন, একটি তত্ত্ব নিহিত আছে। দুর্গা শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ দুর্গতিনাশিনী। এই দুর্গাপূজাকে গ্রামের সাধারণ - মানুষ বড় পূজা বলে আখ্যায়িত করে থাকে। সুতরাং আর্য ধর্মের সবচেয়ে বড় উৎসব হল এই দুর্গোৎসব। এখন এই দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসবের প্রকৃত তত্ত্ব কী এটাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে

॥চতুর্থ পর্ব॥

দুর্গোৎসবের প্রকৃত তত্ত্ব:-

"জয় জয় জপ্যজয়ে জয় শব্দপরস্তুতি তৎপর বিশ্বনুতে
ঝণঝণ ঝিঞ্জিমি ঝিঙ্কৃতনূপুর সিঞ্জিত মোহিত ভূতপতে,
নটিত নটার্ধ নটীনটনায়ক নাটিতনাট্য সুগানরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।"

এখানে পূজা শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে-"যা করলে জীবনে উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়"। পূজা শব্দটি এসেছে পূজ ধাতু থেকে। এই পূজ ধাতুর অর্থ হচ্ছে 'বর্দ্ধনশীলতা'। উৎসব শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'উৎস অভিমুখে গমন' অতএব পূজা বা উৎসব শব্দটি একই অর্থ বহন করে, অর্থাৎ সর্বসমন্বয়করণ বা সার্বিক সমন্বয়, সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শক্তি, আনন্দ ও উন্নতির সমন্বয় ।এই দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসবের মধ্যে দু'টি তত্ত্ব নিহিত আছে। একটি জাগতিক বা সাংসারিক এবং অন্যটি আধ্যাত্মিক।

এ পূজার জাগতিক অর্থ হল বাস্তব জীবনের উন্নয়ন। দুর্গাপূজা করা মানে হচ্ছে দুর্গা হওয়া। দুর্গার দশটি হাতের অর্থ হল দশদিকের কর্মযোগ্যতা বা দক্ষতা। একজন নারী যখন সংসারের সকল কর্মে দক্ষতা লাভে ব্রতী হয় তখনই তার সংসার সুন্দর হয়। আর সুন্দর সংসার হতে হলেই লক্ষ্মীসরস্বত-ীর মত কন্যা এবং গণেশর মত পুত্র হওয়া বাঞ্চনীয়। আর সুন্দর সন্তান জন্মাতে প্রয়োজন স্বামীর প্রতি অবিচ্ছেদ্য টান। কার্তিকে-তাই দুর্গাপূজার শিবঠাকুর দেবীর মাথার উপরে। তাই বলেছেন,

স্বামী রেখে মাথার উপর
ইষ্ট পূজায় জীবন শেষ
সতীতেজের বর্ম নিয়ে-
এরাই গড়বে নূতন দেশ।"

দুর্গার দশটি হাতের মধ্যে একটি আশির্বাদের অভয় হস্ত এবং বাকী নয়টিই হচ্ছে প্রহরণ যন্ত্র। এই নয়টি প্রহরণ যন্ত্র দিয়ে মহাশক্তি জগতের অমঙ্গলকে ধ্বংস করবে। তাই প্রতিটি মা যদি জীবন্ত দুর্গা না হয়ে ওঠে তবে এ পূজার সার্থকতা কোথায়? মাটি দিয়ে গড়া এ প্রাণহীন প্রতিমাকে তাই পুরোহিত মন্ত্রপুত করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, চক্ষুদান করেন। তেমনি প্রতিটি নারীর মাঝে ইষ্টমন্ত্র বা দীক্ষাদান পূর্বক নূতন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও জ্ঞান

চক্ষুদান করে জগতের দুর্গতি নাশে যত্নবান হলেই আমাদের এ দুর্গাপূজা সার্থক হবে। সংসার যখন দুর্গা-মণ্ডপে পরিণত হবে তখনই হবে এ পূজার সার্থকতা। নতুবা মাটির পূজা মাটি হয়েই যাবে।

দুর্গাদেবীর তত্ত্বের আধ্যাত্মিক দিক:

আমার গুরুমা শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর রচিত মায়ের রূপ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যা পুরোটাই তাঁর ধ্যান ও অনুভবে উপলব্ধ রূপে দর্শন :

"দুর্গাসতী ভগবতী সহস্রারে অম্বিকা,
কালরাত্রি সিদ্ধিদাত্রী ধ্যানে তারাকালিকা।"
পরমাশক্তি জগদ্ধাত্রী ভৈরবী দক্ষিনাকালিকা,
আদ্যাশক্তি মহাশক্তি বিশ্বজগৎপালিকা।
পরমাবিদ্যা মহাসতী সারদা যোগিনী বালিকা,
মহাকালী মহারাত্রি দারুণা সৌম্যা করালিকা।
পরমাছন্দা ঋতুস্পন্দা কাম্পিল্যবাসিনী দেবিকা
হৃদকমলে কমলাবালা,সৌম্যা কলা দীপিকা।

BANGL

এখন আসা যাক আধ্যাত্মিক অর্থের দিকে। একটি মানবদেহের তিনটি ধারা বা নাড়ি ইড়া -, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না। এই সুষুম্নাতে অবস্থিত ছয়টি চক্র।এগুলি হচ্ছে মূলাধার, স্বাধীষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, আজ্ঞা এবং সহস্রার। আমাদের মণিপুর চক্র বা দশম দলে দুর্গা পূজা হয়। মূলাধারে চতুর্থদল পদ্মে মহামায়া অবস্থিত। ভক্ত যখন প্রণব বীজের সাহায্যে মহামায়ার মায়া বন্ধন ছিন্ন করোতঃ স্বাধীষ্ঠান চক্র পার হয়ে মণিপুর চক্র বা দশম দলে সাধনায় ব্রতী হয় তখনই শুরু হয় যোগমাযা বা দুর্গাদেবীর সাধনা । এই সাধনায় সিদ্ধ হলে মানুষ মায়াপাশ ছিন্ন করতে পারে এবং ত্রিতাপের জ্বালা থেকে নিস্কৃতি পায়।

"অয়ি সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনোহর কান্তিয়ুতে
শ্রিত রজনী রজনী রজনী রজনীকর বক্ত্রবৃতে,
সুনয়ন বিভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমরাধিপতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।"

শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে লক্ষ্য করে বলেন, "গুণময়ী মহামায়া দুর্জয়া, মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে"। অর্থাৎ দৈবিমায়া দিয়ে জগতকে আচ্ছন্ন করে রেখেছি একমাত্র আমার কৃপা ছাড়া ।

“ব্রহ্মময়ী সনাতনী সাকার রূপিণী
নিত্যকালী নিরাকারা জগৎজননী।”
মহেশ্বরী মহামায়া মহেশমোহিনী,
যজ্ঞেশ্বরী যোগমায়া নীরদ বরণী।

- সাধক রামপ্রসাদ

এই দৈবী মায়া অতিক্রান্ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং এ পূজা আমাদের বন্ধনমুক্তির পূজা। এ পূজা সকল সংকীর্ণতা, কুসংস্কার ও ভেদ বুদ্ধির অবসান ঘটায়। মায়ের এক নাম ব্রহ্মময়ী। এই ব্রহ্ম শব্দটির বুৎপত্তিগত ধাতু হল বৃন্হ অর্থাৎ বিস্তৃতি। অতএব বিস্তৃতির মধ্যে যার অস্তিত্ব তিনিই ব্রহ্মময়ী। তাই এই ব্রহ্মময়ী দেবীর আরাধনায় আমরা বৃহতের সন্ধান পাই। অসুরনাশিনী মা যে অসুরগুলির বিনাশ করেন সেগুলি আমাদের মধ্যে নিত্য বিরাজ করছে। সেগুলি হল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। এই ষড়রিপুর বহির্মুখী গতিকে ফিরিয়ে এনে অন্তর্মুখী মায়ের চরণে নিবেদন করাই প্রকৃত দুর্গাপূজা। তাই আসুন হে বিশ্ববাসীহৃদয়ের - মায়ের শ্রীচরণে নিবেদন করি। দেবীদহ থেকে শতাষ্টো নীলপদ্ম চয়ন করে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে নিজেকে বেঁধে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে সকলে গেয়ে উঠি-

“যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা
নমোস্তস্যৈ নমোস্তস্যৈ নমোস্তস্যৈ নমো নমঃ॥”

দুর্গার অবতার:-

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী দুর্গা নিজের মুখেই বিন্ধ্যপর্বতবাসিনী, রক্তদন্তিকা, শতাক্ষী শাকম্বরী, দুর্গা, ভীমা এবং ভ্রামরী রূপে আবির্ভূত হওয়ার কথা বলেছেন।

আছেচণ্ডীতে অষ্টবিংশ যুগে বৈবস্বত মন্বন্তরে দেবী দুর্গা নন্দগোপের গৃহে যশোদা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ - নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয়কে বধ করবেন।-করবেন এবং শুম্ভ

দুর্গা বিপ্রচিত্তি বংশীয় অসুরগণকে বধ করার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন এবং অসুরগণকে ভক্ষণ করার কারণে তাঁর দন্তগুলো ডালিম ফুলের মত রক্তবর্ণ হয়ে যাবে। এজন্য দুর্গা রক্তদন্তিকা নামে পূজিতা হবেন।

পুনরায় শতবর্ষ ধরে অনাবৃষ্টি এবং জলাভাব ঘটলে মুনিগণের প্রার্থনায় দুর্গা অযোনিসম্ভবা হয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হবেন। তখন তিনি শতনয়নে মুনিগণকে দেখবেন বলে তাঁকে শতাক্ষী নামে ডাকা হবে।

অনাবৃষ্টির কারণে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, তখন দুর্গা দুর্দশাগ্রস্ত মানবগণকে নিজ দেহ থেকে উৎপন্ন প্রাণ-রাখবেন। এজন্য তিনি শাকম্বরী নামে খ্যাতা হবেন। ধারক শাক দিয়ে বাঁচিয়ে

সে সময় দুর্গা দুর্গম্ নামক এক মহাসুরকে বধ করে দুর্গা নামে পরিচিতা হবেন।

পুনরায় দুর্গা হিমালয়ে মুনিগণের রক্ষার জন্য ভীষণা মূর্তি ধারণ করে রাক্ষসদের বধ করবেন। তখন তাঁকে ভীমা নামে ডাকা হবে।

যখন অরুণ নামক এক অসুর ত্রিলোকে উৎপাত সৃষ্টি করবে, তখন দুর্গা ভ্রমরময় ভ্রমরের রূপ ধারণ করে ঐ মহাসুরকে বধ করবেন। এজন্য দুর্গা ভ্রামরী নামে খ্যাতা হবেন।

“কনকলসৎকলসিন্ধুজলৈরনু সিঞ্চিনুতে গুণ রঙ্গভুবম-
ভজতি স কিং নু শচীকুচকুম্ভত তটী পরিরম্ভ সুখানুভবম,
তব চরণং শরণং করবাণি নতামরবাণি নিবাশি শিবম
জয় জয় হে মহিষাসুর"মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।-

BANGL

নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে

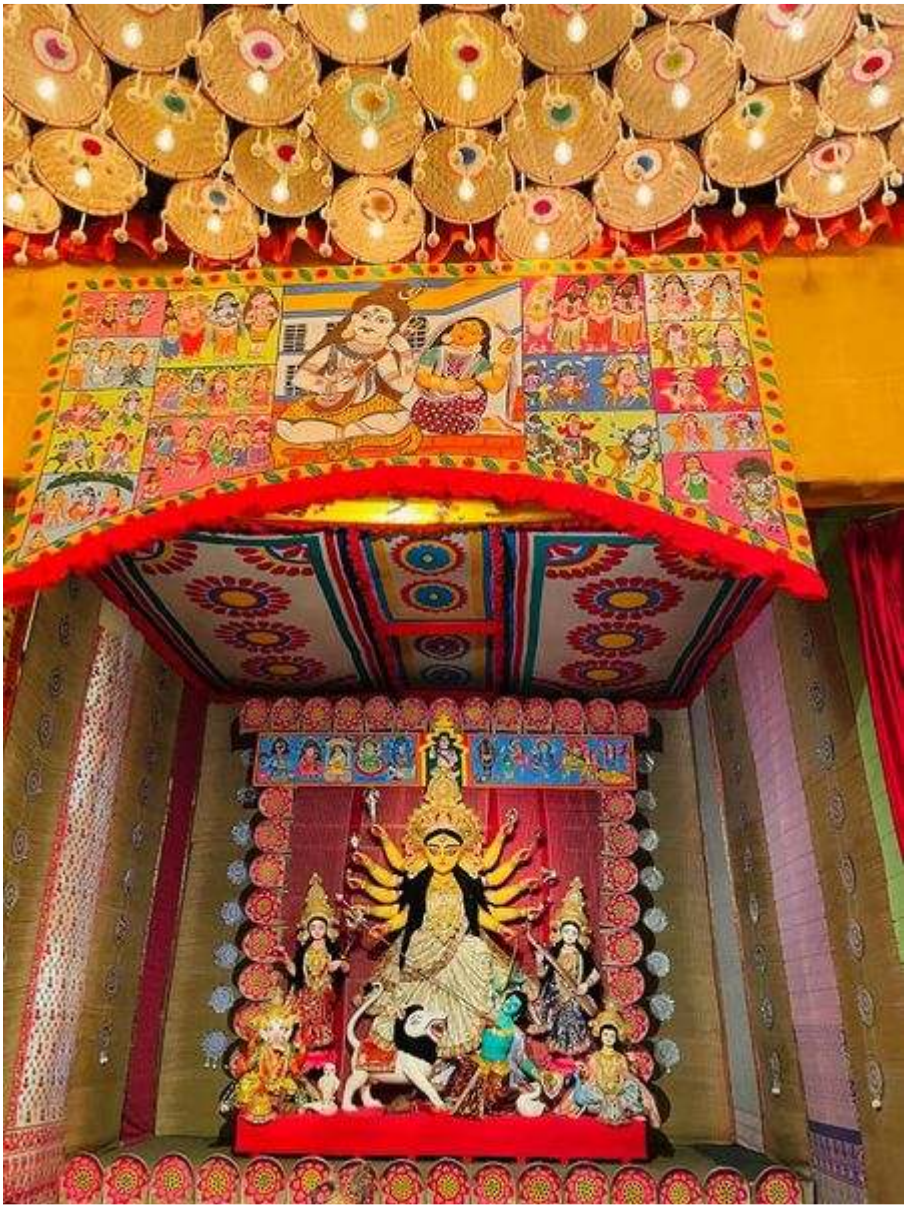

নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে

॥পঞ্চম পর্ব॥

নবদুর্গা:-

মাদুর্গার নয়টি স্বরূপকে নবরাত্রির নয় দিনে পূজা করা হয়। এই নবম শক্তিকে বলা হয় নবদুর্গা।

প্রথমং শৈলপুত্রী চ দ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চন্দ্রঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্॥
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি, ষষ্ঠম্ কাত্যায়নীতি চ।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমং॥
নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নবদুর্গা প্রকীর্তিতাঃ॥

পুরাণ শাস্ত্রে দুর্গার যে নয়টি রূপ উল্লেখ আছে তা হল–শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চণ্ডঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়ণী, কালরাত্রী, মহাগৌরী এবং সিদ্ধিদাত্রী। এদেরকে একত্রে নবদুর্গা বলা হয়। এখানে সংক্ষেপে সেই পরিচিতি :

শৈলপুত্রী রূপে শৈলপুত্রী নামে জন্মগ্রহণ করেন (কন্যা) শৈল অর্থ পর্বত। পর্বতরাজ হিমালয়ে ঘরে দুর্গা পুত্রী : এবং কঠোর তপস্যা বলে ভগবান শিবকে পতি রূপে লাভ করেন।যোগী সেইদিন নিজের মনকে মূলাধার চক্রে স্থিত করে যোগ- সাধনা আরম্ভ করেন। মাতা শৈলপুত্রী সূর্য্যকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এইদিন দেবীকে ঘি দিয়ে ভোগ নিবেদন করার কথা বলে শাস্ত্রে।

বন্দে বাঞ্ছিতলাভায় চন্দ্রার্ধকৃতশেখরাম্।
বৃষারুঢ়াং শূলধরাং শৈলপুত্রী যশস্বিনীম্॥

ব্রহ্মচারিণী ইন্দ্র :, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবগণকে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করার জন্য ব্রহ্মচারিণী আবির্ভূত হয়েছিলেন। দেবতাদের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ করেছিলেন বলে তিনি ব্রহ্মচারিণী। 'ব্রহ্মা' শব্দের অর্থ এখানে 'তপস্যা'। ব্রহ্মচারিণী দেবীর স্বরূপ পূর্ণ জ্যোতির্ময়ী। তাঁর ঐ রূপটি হৈমবতী উমা নামেও পরিচিত।দ্বিতীয় দিনে মা ব্রহ্মচারিণীর উপাসনায় সাধক নিজের মনকে সাধিষ্ঠান চক্রে স্থিত করেন এবং দেবীর কৃপালাভ করেন। ইনি শনি গ্রহকে নিয়ন্ত্রণ করেন।এইদিন দেবীকে ভোগে চিনি আর পানিফলের আটার হালুয়া দেবার কথা বলে শাস্ত্রে।

দধানা করপদ্মাভ্যামক্ষমালাকমণ্ডলুম্।
দেবী প্রসীদতু ময়ি ব্রহ্মচারিণ্যনুত্তমা॥

চন্দ্রঘন্টা অসুর বধের :জন্য দেবী প্রকটিতা হলে দেবরাজ ইন্দ্র দেবীকে একটি ঘণ্টা উপহার দিলেন, তখন দেবীর নাম হল চন্দ্রঘণ্টা। সকল বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনির সমষ্টি হল ঘণ্টা। ঐ ঘণ্টা ধ্বনি শুনে সব অশুভ শক্তি ভয়ে পলায়ন করে। মা দুর্গার তৃতীয় স্বরূপ দেবী চন্দ্রঘণ্টার উপাসনায় সাধক নিজের মনকে মনিপুর চক্রে স্থিত করে সাধনা করেন এবং দিব্যদর্শন লাভ করেন। ইনি চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করেন।এইদিনে দেবীকে দুধ দেওয়া হয় ভোগে, সাবুর পায়েস বা মাখানার পায়েস করে নিবেদন করা হয়।

পিণ্ডজপ্রবরারুঢা চণ্ডকোপাস্ত্রকৈর্যুতা।
প্রসাদং তনুতে মহ্যম্ চন্দ্র ঘণ্টেতি বিশ্রুতা॥

কুষ্মাণ্ডা র্থ কুৎসিত যে তাপ। আধিভৌতিকউষ্মা অর্থ তাপ। কুষ্মা অ :, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিতাপই হল কুষ্মা। যিনি কুষ্মা বহন করেন তিনি কুষ্মাণ্ডা। দেবী কুষ্মণ্ডারূপে সকল ত্রিতাপ জ্বালা ভক্ষণ করে উদরপূর্তী করেন। ফলে ভক্তগণ শন্তিলাভ করেন। সাধক নিজের মনকে অনাহত চক্রে স্থিত করে সাধনা করেন।মাতা কুষ্মাণ্ডা বৃহস্পতি গ্রহকে নিয়ন্ত্রণ করেন।এইদিনে কুট্টু আটার বা Buckwheat Flour এর মালপোয়া ভোগ দেবার রীতি আছে।

সুরাম্পূর্ণকলশং রুধিরাপ্লুতমেব চ।
দধানা হস্তপদমাভ্যাং কুষ্মাণ্ডা শুভদাস্তু মে॥

স্কন্দমাতা কার্তিকের :অপর নাম স্কন্দ, সুতরাং দেবী যখন কার্তিকের মাতা হয়েছিলেন তখন তিনি স্কন্দমাতা নামে খ্যাতা হয়েছিলেন। দেবী স্কন্দমাতার আরাধনায় সাধক নিজের মনকে বিশুদ্ধ চক্রে স্থিত করে আরাধনা করেন। মা স্কন্দমাতার উপাসনায় ভক্তের সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়। সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্কন্দমাতার উপাসক এক অলৌকিক তেজ এবং কান্তি সম্পন্ন হয়ে থাকেন। এক অলৌকিক প্রভা অদৃশ্য ভাবে চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত থাকে। এই প্রভামণ্ডল প্রতিক্ষণ সাধকের যোগ এবং ক্ষেম বহন করে। মঙ্গল গ্রহকে নিয়ন্ত্রণ করেন দেবী।এইদিনে কলা দিয়ে ভোগ নিবেদিত হয়।

সিংহাসনগতা নিত্যং পদ্মাশ্রিতকরদ্বয়া।
শুভদাস্তু সদা দেবী স্কন্দমাতা যশস্বিনী॥

কাত্যায়নী ঋষি কাত্যায়ণের আশ্রমে সর্বদেবতার তেজে যে দেবীর উদ্ভব হয়েছিল সে দেবীই :
োহা এইরূপ কাত্যায়ণী।মায়ের নাম কাত্যায়নী হওয়ার পশ্চাতে যে কিংবদন্তি আছে ত– কত নামে এক

প্রসিদ্ধ মহর্ষি ছিলেন। তাঁর পুত্র হলেন কাত্য। ঋষি কাত্যের বংশে বিশ্বপ্রসিদ্ধ মহর্ষি কাত্যায়ন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাতা ভগবতীকে পুত্রী রূপে লাভের মনস্কামনায় মহর্ষি কাত্যায়ন বহু বৎসর কঠিন তপস্যা করেন। অবশেষে মাতা ভগবতী তাঁর প্রার্থনা স্বীকার করেন। কাত্যায়নের কন্যা বলে মাদুর্গার নাম হল কাত্যায়নী।

কথিত আছে যে কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করে, শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী এই তিন দিন ঋষি কাত্যায়নের পূজা গ্রহণ করে দেবী কাত্যায়নী দশমীতে মহিষাসুরকে বধ করেন। মতান্তরে, মহিষাসুরের অত্যাচারে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল যখন ভীত, সন্ত্রস্ত, কম্পিত তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত তেজ রাশি থেকে এক দেবী সৃষ্টি হলেন। ঋষি কাত্যায়ন সর্বপ্রথম সেই দেবী মাতাকে পূজা করেন বলে তার নাম হল কাত্যায়নী।এইদিনে মধু দিয়ে ভোগ নিবেদনের রেওয়াজ আছে।

কৃষ্ণ যাতে পতি হন এই কামনা করি,
কাত্যায়নী ব্রত করে ব্রজের যুবতী।

ভগবান কৃষ্ণকে পতি রূপে লাভের মনস্কামনায় একমাস যমুনায় প্রাতঃ স্নান করে কাত্যায়নী ব্রত করেন ব্রজের গোপীগণ এবং তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। মা কাত্যায়নী অমোঘ ফলদায়িনী। নবরাত্রির ষষ্ঠ দিনে দেবী দুর্গার ষষ্ঠ স্বরূপ দেবী কাত্যায়নীর আরাধনা করা হয়। সাধক নিজের মনকে আজ্ঞা চক্রে স্থিত করে যোগ সাধনা করেন।

শুক্র গ্রহকে নিয়ন্ত্রণ করেন মাতা কাত্যায়নী।
চন্দ্রহাসোজ্জ্বলকরা শার্দূলবরবাহনা।
কাত্যায়নী শুভং দদ্যাদ্দেবী দানবঘাতিনী॥

কালরাত্রি মূলত যোগনিদ্রা বা যোগমায়াই কালরাত্রী। কালরাত্রীতে বিষ্ণু ন :িদ্রাচ্ছন্ন থাকেন এবং দেবী জগতের লয় করেন।ত্রেতাযুগে জনকনন্দিনী সীতা, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বে যিনি জন্মগ্রহণ করে দেবকীগর্ভে কংসের হাতে হত্যা হবার পূর্বে তোমারে বধিবে যে ", গোকুলে বাড়িছে সে বলে মিলিয়ে গেছিলেন তিনিই " যোগমায়া।এইদিনে গুড় দিয়ে ভোগ নিবেদিত হয়।সাধক নিজের মনকে সহস্রার চক্রে স্থিত করে উপাসনা করেন। তাঁর জন্য ব্রহ্মাণ্ডের সকল সিদ্ধির দ্বার অবারিত হয়ে যায়। এই চক্রে অবস্থিত সাধকের মন সম্পূর্ণ ভাবে মাতা কালরাত্রির স্বরূপে অবস্থান করে। তাঁর সাক্ষাৎ প্রাপ্তিতে সাধক মহাপুণ্যের ভাগী হন। মা কালরাত্রির উপাসক অগ্নি ভয়, জল ভয়, জন্তু ভয়, শত্রু ভয়, রাত্রি ভয় আদি হইতে মুক্ত হন। মা কালরাত্রি শুভঙ্করী। তিনি অগণিত শুভফল প্রদানকারী। রাহু গ্রহের অশুভ প্রভাব ও গ্রহবাধা মায়ের উপাসনায় বিনষ্ট হয়।

একবেণী জপাকর্ণপুরা নগ্না খরাস্থিতা
লম্বোষ্ঠী কর্ণিকাকর্ণী তৈলাভ্যস্ত শরীরিণী।
বামপদোল্লসল্লোহলতাকং ভূষণা
বর্ধনমূর্ধধ্বজা কৃষ্ণা কালরাত্রি ভয়ঙ্করী॥

মহাগৌরী পুরাণ মতে দেবী কালিকা তপস্যার দ্বারা কালো বর্ণ ত্যাগ করে গৌরবর্ণ ধারণ করেন :, তখন তাঁর নাম হয় মহাগৌরী।এইদিনে নারকোল ও নারকোলের মিষ্টি, নাড়ু দিয়ে ভোগ নিবেদিত হয়।মায়ের শক্তি অমোঘ এবং অনন্ত। মায়ের উপাসনায় ভক্তের সমস্ত পাপ ও ক্লেষ বিনষ্ট হয়। মায়ের স্মরণ, পূজন, ধ্যান ও আরাধনায় ভক্তের অতি সহজেই সিদ্ধি লাভ হয়। মাতা মহাগৌরী বুধ গ্রহকে নিয়ন্ত্রণ করেন। বুধের অশুভ প্রভাব মায়ের কৃপায় হ্রাস পায়।

শ্বেতবৃষে সমারূঢ়া শ্বেতাম্বরধরা শুচিঃ ।
মহাগৌরী শুভং দধান্মহাদেব প্রমোদদা॥

সিদ্ধিদাত্রী দেবী যে রূপে সাধককে সিদ্ধি দান করেণ সে রূপের নাম সিদ্ধিদাত্রী। এইদিনে মাকে হালুয়া:, লুচি আর চানা বা ছোলা দিয়ে ভোগ নিবেদন করে উপবাস ভঙ্গ করে সকলে।দেবী সিদ্ধিদাত্রী সর্বপ্রকারের সিদ্ধি প্রদানকারী। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে অষ্টসিদ্ধি বা আট প্রকারের সিদ্ধি রয়েছে, যেমন- অণিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব এবং বশিত্ব। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে অষ্টাদশ সিদ্ধির বিষয়ে বলা হয়েছে। যেমন –

1. অণিমা 2. লঘিমা 3. প্রাপ্তি 4. প্রাকাম্য 5. মহিমা 6. ঈশিত্ব, বশিত্ব 7. সর্বকামাবসায়িতা 8.সর্বজ্ঞত্ব 9. দূরশ্রবণ 10. পরকায়প্রবেশন 11. বাকসিদ্ধি 12. কল্পবৃক্ষত্ব 13. সৃষ্টি 14. সংহারকরণসামর্থ্য 15. অমরত্ব 16 সর্বন্যায়কত্ব 17 . ভাবনা 18 সিদ্ধি।

মা সিদ্ধিদাত্রী ভক্ত এবং সাধককে উপরোক্ত সর্ব সিদ্ধি প্রদানে সক্ষম। তাই মায়ের অপর নাম সিদ্ধেশ্বরী।দেবীপুরাণ অনুসারে ভগবান শিব, দেবী সিদ্ধিদাত্রীর কৃপাতেই সিদ্ধি প্রাপ্ত করেছিলেন। মায়ের অনুকম্পাতেই ভগবান শিবের অর্ধেক শরীর দেবীতে পরিণত হয় এবং তিনি অর্ধনারীশ্বর নামে খ্যাত হন। শাস্ত্রীয় বিধি – বিধান অনুসারে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে উপাসনা করিলে সাধক সর্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত করেন। জগতের কোনকিছুই আর তার পক্ষে অসম্ভব নয়। মা সিদ্ধিদাত্রীর কৃপায় সাধকের লৌকিক ও পারলৌকিক সর্ব কামনা পূর্ণ হয়। মা সিদ্ধিদাত্রীর আরাধনায় এবং তাঁর কৃপায় কেতু গ্রহের অশুভ প্রভাব হ্রাস হয় ।

গন্ধর্বযক্ষাধৈরসুরৈরমরৈরপিসেব্যমানা
সদা ভূয়াৎ সিদ্ধিদা সিদ্ধিদায়িনী॥

আসলে নবরাত্রি ব্রততে পঞ্চশস্যের কোনো শস্যের জিনিস খাওয়া বা নিবেদন নিষেধ, তাই ফল এবং এইসব জিনিস দিয়ে ভোগ দেওয়া হয় দেবীকে।

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে একমাত্র বাংলা ছাড়া দেবীপক্ষে এই নবদুর্গার পূজা প্রচলিত আছে।

নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে

॥ষষ্ঠ ও অন্তিম পর্ব॥

উর্ণনাভ:-

প্রাক আর্য যুগ থেকেই ভারতে শক্তি উপাসনা প্রচলিত। সেই যুগে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির ভয়াল রূপকে ঠিক মতো ব্যাখ্যা করতে পারত না। প্রাকৃতিক নানান দুর্যোগের কাছে তারা তখন নিতান্ত অসহায়। সেই হেতু তারা সেই সমস্ত অলৌকিক ও দুর্জয় শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করতেন। প্রকৃতিকে স্বয়ং শস্যশ্যামলা মাতৃরূপে তথা মাতৃশক্তিরূপিনী জগদম্বা রূপে কল্পনা করা হত। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও মহামায়াকে পরাশক্তির আদাররূপিনী রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

কালিকা পুরাণে আমরা দেখি, আদি শক্তিরূপে তিনি যোগীদের মন্ত্র ও মন্ত্রের মর্ম উদঘাটনে তত্পর। পরমানন্দা সত্ত্ববিদ্যাধারিণী জগন্ময়ী রূপ তাঁর। বীজ থেকে যেমন অঙ্কুরের নির্গমন হয় এবং জীবের ক্রমবিকাশ হয় তেমনই সেই সব সৃজনই তাঁর সৃষ্টিশক্তি।

মা দুর্গার মূর্তি দর্শন করার সময় একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে মায়ের কপালের নিচে নাকের কাছে একটা চিহ্ন আছে। কী সেই চিহ্ন আর কী বা তার অর্থ জানলে অবাক হতে হয় !

মা দুর্গার কপাল ও নাকের মাঝামাঝি থাকা এই চিহ্ন টি আসলে উর্ণনাভ বা মাকড়সার চিহ্ন। এই চিহ্নটি ডাকের সাজের মূর্তিতে বেশি চোখে পড়ে।

আসলে মায়ের রূপের মধ্যে এই উর্ণনাভের চিহ্ন মায়া রূপে চিত্রিত হয়। এটি মহামায়ার একটি প্রতীক। মাকড়সা যেমনভাবে নিজে জাল বিস্তার করে কিন্তু নিজে সে জাল এর মধ্যে জড়ায়না, ঠিক সেইরকম ভাবে মহামায়া মায়ার সৃষ্টি করেন কিন্তু মায়া সর্বদাযই মহামায়ার অধীন। মহামায়া আবার বৈষ্ণবীশক্তি বা বৈষ্ণবীমায়া,

“যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত অভিধান শব্দকল্পদ্রুম এ বলা হচ্ছে ‘কাল শিবহ্। তস্য পত্নতি কালী।’ অর্থাৎ শিবই কাল বা কালবোধক। তাঁর পত্নী কালী যিনি কালকে রচনা করেন । কালী হচ্ছেন মা দুর্গার বা পার্বতীর অপর ভয়াল রূপ। তিনি সময়ের, পরিবর্তনের, শক্তির, সংহারের দেবী। তিনি কৃষ্ণবর্ণা বা মেঘবর্ণা এবং ভয়ংকরী । সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ভয়ংকরেরও পূজা করেন। তিনি অশুভ শক্তি’র বিনাশ করেন। তাঁর এই শক্তি’র পূজা সনাতন সমাজকে প্রভাবিত করেছে, বিশুদ্ধ শক্তি সঞ্চারিত করেছে, অন্তর শুদ্ধি

দিয়েছে, দুর্দিনের দুর্বলতায় সাহস দিয়েছে। শাক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব মতে এবং শাক্ততান্ত্রিক বিশ্বাস মতে-, তিনিই পরম ব্রহ্ম। কালীকে এই সংহারী রূপের পরেও আমরা মাতা সম্বোধন করি। তিনি সন্তানের কল্যাণ চান তিনি মঙ্গলময়ী, তিনি কল্যাণী এটাই তাঁর প্রতি সনাতন ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল আস্থা ও নির্যাস।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে,
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে ।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপদারবিন্দে,
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে॥
নমস্তে জগাচ্চিন্ত্যমান স্বরূপে,
নমস্তে মহাযোগিনী জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দ নন্দ স্বরূপে,
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে॥
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য,
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধাস্যজন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তার কর্ত্রী,
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে॥
অরণ্যে রণে দারুনে শত্রুমধ্যে,
অনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগৃহে॥
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতু,
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে॥
অপারে মহাদুস্তরে অত্যন্ত ঘোরে,
বিপৎসাগরে মজ্জাতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তার নৌকা,
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে॥
নমশ্চন্ডিকে চণ্ডদোর্দন্ডলীলা,
লসৎখন্ডিতাখন্ডলাশেষাভীতে । -
ত্বমেকা গতির্বিঘ্ন সন্দোহহন্ত্রী ,
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে॥
নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে,
সরুস্বত্যরুন্ধন্ত্যমোঘ স্বরূপে।

BANGL

বিভূতিঃ শচী কালরাত্রি স্বরূপে,
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে॥
ত্বমেকাহজিতা রাজিতা সত্যবাদিন্যমেয়া,
জিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী,
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে॥
শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং,
মুনিদনুজ নারাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতি গৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং,
ত্বমসি শরণমেকা দেবী দুর্গে প্রসীদ॥
প্রসীদ প্রসীদ দেবী, প্রসীদ মাতা বিশ্বরূপিণী।
প্রণম্যাহম জগত্তারিণী দেবী সর্বাণী ভবানী শিবানী।

কালীর অন্য নাম শ্যামা বা আদ্যাশক্তি। সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দু তথা বাঙালিদের কাছে এই দেবী বিশেষভাবে শক্তির দেবী রূপে পূজিত হন।সনাতন ধর্মকে যদি আলাদা -ম মাহাত্ম্যে কালনা-মতে এর উল্লেখ মেলে। কালী-এর একাধিক অর্থ বের হয়। কাল মানে সময়-করে নেওয়া হয় তাহলে কাল, আবার কাল তথা কৃষ্ণবর্ণ। কাল-বা মৃত্যু ভাবনাতেও। কালীকে কাল অর্থাৎ সময়ের জন্মদাত্রী বলা যেতে -এ লুকিয়ে আছে সংহার-এর অর্থ পারে, আবার পালনকর্ত্রী এবং প্রলয়কারিণী নিয়ন্ত্রক বলা হয়। এবং সেই কারণেই দেবীর নাম কাল যুক্ত ঈ -কে উল্লেখ করা হয়েছ-কারের সৃষ্টি ও শব্দোচ্চারণ-কালী। সনাতন ধর্মে ঈ ঈশ্বরী বা সগুণ ও নিগুর্ণ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার জন্য। আবার শ্রীশ্র চণ্ডীতে উল্লেখ মেলে যে,

‘যা দেবী সর্বভুতেষু চেতনেত্যাবিধীয়তে,
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমোঃ।’

এই কারণে অনেকেই কালীকে ক্রোধান্বিতা-, রণরঙ্গিনী বা করালবদনা বলেও অভিহিত করে থাকেন। ‘কালী’ নাম কেন? কালকেও কাল নামে ডাকা হয়। কাল মানে অনন্ত সময়। এই -এর স্ত্রীলিঙ্গ হল কালী। আর শিব-খ করা হয়েছে যে যে কাল সর্বজীবকে গ্রাস করেসময়েরই স্ত্রীলিঙ্গ বোধক হচ্ছে কালী। শাস্ত্রে উল্লে, সেই কালকে আবার যিনি গ্রাস করেনতাঁকেও কালী বলা হয়। জগতের উৎপত্তি-, স্থিতি, মহাপ্রলয়এর পিছনে -রয়েছে কালশক্তি। সবচেয়ে মজার কথা এই সবের জন্য যে মহাকাল পরিস্থিতির উদ্ভূত হয় তাই আবার সব উল্লেখ যে মহাকালেরও পরিণাম আছে। মহাপ্রলয়ের কালশক্তি মহাকালীর সৃষ্টিকে গ্রাস করে। সনাতন ধর্মে ভিতরেই নিঃশেষ লীন হয়ে যায়।

আদ্যাশক্তিঃ মা দুর্গা হলেন আদ্যাশক্তি মহামায়া । জগতের মূল শক্তি ইনি । ইনি মহা সরস্বতী । ইনিই মহালক্ষ্মী । ইনি রুদ্রানী শিবানী । ইনি ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী , নারায়নের শক্তি নারায়নী , শিবের শক্তি শিবা। ইনি নারসিংহী , ইনি বারাহী , ইনি কৌমারী , গন্ধেশ্বরী । ইনি শ্রীরামচন্দ্রের শক্তি সীতা দেবী)রামস্য জানকী ত্বং হি রাবণধ্বংসকারিনী (, ইনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি , ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী মা সারদা । ইনি মহিষমর্দিনী চণ্ডী , ইনি চামুন্ডা , কৌষিকী , দুর্গা ভগবতী । এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁর ইচ্ছাতেই চলছে । মায়ের ইচ্ছা ভিন্ন গাছের একটা পাতাও নড়ে না ।

• সংহার রূপিনিঃ সংহার শব্দের অর্থ ঠিক ধ্বংস নয় । সংহরন । নিজের ভিতরে প্রত্যাকর্ষণ যেমন ।(উর্ণনাভ) সমুদ্রের ঊর্মিমালা সমুদ্রের বক্ষ থেকেই উদ্ভুত হয় আবার সমুদ্রেই লয় হয় । যেমন উর্ণণাভ নিজের গর্ভ থেকে নিজের পেটেই গুটিয়ে নেয় । মৃত্যুর অর্থ পৃথ জাল রচনা করে আবারিবী থেকে , নিকট জনের থেকে চির বিদায় নেওয়া – কিন্তু সেই জগত জননীর কোলে আশ্রয় পাওয়া। তাই নজরুল বলছেন,

BANGL

“শ্মশানে জাগিছে শ্যামা
অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে
জননী শান্তিময়ী বসিয়া আছেন ওই
চিতার আগুণ ঢেকে স্নেহ আঁচলে।
সন্তানে দিতে কোল ছাড়ি সুখ কৈলাস
বরাভয় রূপে মা শ্মশানে করেন বাস
কি ভয় শ্মশানে, শান্তিতে যেখানে
ঘুমাবি জননীর চরণতলে?
জ্বলিয়া মরিলি কে সংসারজ্বালায়-
তাহারে ডাকিছে মা, চলে আয়, চলে আয়
জীবনে শ্রান্ত ওরে, ঘুম পাড়াইতে তোরে
কোলে তুলে নেয় মা মরণের ছলে॥”

এই ব্রহ্মাণ্ড সেই মহামায়ার ইচ্ছাতেই রচিত , সংহার কালে তিনি আবার সব গুটিয়ে নেন ।

দেবী কিছুর বন্ধনে আবদ্ধ নন । তিনি দেশ কালের ওপারে কালাতীত । তিনি সকল জীবের মাতা । এক দিকে দেবী বিশ্বমধ্যে, আবার অন্য দিকে তিনি বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বাতীত। যাঁর স্বরূপ এমন, তাঁকে কি কোনও বস্ত্র দিয়ে আবরিত করা সম্ভবকার কী এমন সাধ্য আছে তা !ঁর ওই রকম বস্ত্র তৈরী করার? তাই তিনি ঋষি কল্পনায় দিগম্বরী বা নগ্নিকা, আবার সন্তানের জন্য তিনি দশপ্রহরণধারিণী সিংহবাহিনী দুর্গা । এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন কিছু পণ্ডিত বসনকে কামনা বাসনার প্রতীক বলেছেন । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীনিদের বস্ত্রহরণ করেছিলেন।

যারা মূর্খ , নাস্তিক তারা এর মধ্যে অশ্লীলতার প্রসঙ্গ খোঁজেন । এর মানে কিন্তু এই না আমাদের বসনহীন হয়ে থাকতে হবে । খালি কামনা বাসনা আদি ষড়রিপু বর্জন করতে হবে । তবেই দেবকৃপা পাওয়া যাবে । তাই সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে অহং ও অবিদ্যাকে ত্যাগ করেই মায়ের কাছে যেতে হবে ।

• মুক্তকেশীঃ মা মুক্ত স্বভাবা । তাই তিনি মুক্তকেশী । তাঁর মাথার ঘন কালো চুল বাঁধা অবস্থায় থাকে না। যোগশাস্ত্রে মুক্তকেশ বৈরাগ্যের প্রতীক। তিনি চিরবৈরাগ্যের প্রতীক। তিনি জ্ঞানের দ্বারা লৌকিক বা জাগতিক সকল বন্ধন ছিন্ন করতে পারেন। তাঁর জ্ঞান খড়্গের দ্বারা অষ্টপাশ ছিন্ন হলেই নিস্কাম সাধক দেবীর কৃপা পান। তবেই মুক্তি ঘটে। রামপ্রসাদ তাই গাইলেন

“মুক্ত কর মা মুক্তকেশী
ভবে যন্ত্রনা পাই দিবানিশি।”

দেবীর সেই কেশ মৃত্যুর প্রতীক, জীবের সমস্তজন্মের সংস্কার সংরক্ষিত থাকে মায়ের কেশের জটাজালে । চন্ডীতে আছে মহিষাসুরের হাতে পরাজিত দেবতারা যখন ত্রিদেবের কাছে গেলেন, তখন ত্রিদেব ও সমস্ত দেবতাদের তেজ রাশি একত্রিত হয়ে ভগবতী মহামায়ার আবির্ভাব ঘটে । যমের তেজে দেবীর কেশরাশি গঠিত হয়।আবার বিষ্ণুপুরাণ মতে, যম শ্রীবিষ্ণুর আরেক সত্তা যা নাকী জীবন থেকে মৃত্যুতে পরিবর্তন ঘটায় তার জন্মের, তাই সেই শ্রীবিষ্ণু নচিকেতাকে জ্ঞান দান করেন আত্মতত্ত্বের কঠোপনিষদে।

মহামায়া কখনোই মায়ার মধ্যে আবদ্ধ নন। মহামায়া হলেন স্বয়ং ব্রহ্ম। যিনি মায়া বিস্তার করেছেন তিনি মায়ার মধ্যেই আছেন কিন্তু মায়ার ঊর্ধ্বে তিনি। অর্থাৎ মায়া কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনা মহামায়ার ওপর। এই তত্ত্বকেই তুলে ধরা হয় মায়ের মুখে উর্ণনাভ চিহ্ন সৃষ্টির মাধ্যমে। এই কারণে দুর্গাপূজার সময় অনেকে বাড়িতে মাকড়সা এলে তাকে তাড়ান না। কারণ এটি দেবী দুর্গার প্রতিক।

ত্রিনয়নীঃ দেবীর ত্রিনয়ন। দেবীর একটি নয়ন চন্দ্রস্বরূপ, আর একটি সূর্যস্বরূপ। তৃতীয়টি অগ্নিস্বরূপ। দেবী ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব কিছুই প্রত্যক্ষ করেন। ‘তমসো মা জ্যোতির্গময়’ অর্থাৎ অন্ধকার থেকে আলোতে বা জ্যোতিতে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আবার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অধিপতি। অর্থাত্ তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতেও অবস্থান করবেন। তাঁর ত্রিনয়নের ইঙ্গিতেই ত্রিকাল নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রকাশ্য দিবালোকে,সন্ধ্যায় বা রাত্রে আমরা যে কাজ করিনা কেন,তিনি দেখছেন কারণ আত্মার মধ্যে তিনিই দ্রষ্টা হয়ে বসে আছেন - চৈতন্যরূপে। আমরা যদি গোপনে পাপ কাজ করে প্রভাব খাটিয়ে এই পৃথিবীর বিচারসভার হাত থেকে নিস্কৃতি পাইও, তবুও দেবী সব দেখেন - তাঁর বিচার থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে না । কারণ তিনি অবস্থান করছেন প্রতিটি জীবের দেহঘটে মূলাধার থেকে সহস্রারের প্রতিটি চক্রে বিভিন্ন শক্তির রূপ ধরে, কারণ যৌগিক ভাবে প্রতিটি চক্রে শিব শিবানী অবস্থান করেন এবং তাদের সমরস্যভাবই জীবের চেতনার গতি নিরুপণ করে। -

ত্রিনয়নী দুর্গা;

মা তোর রূপের সীমা পাইনা খুঁজে,
চন্দ্র তপন লুটায় মা তোর
চরণতলে দশভুজে।
বন্দনা গায় সরস্বতী,
লক্ষ্মী সাজায় সন্ধ্যারতি;
কার্ত্তিকেয় সিদ্ধিদাতা
সিদ্ধ যে মা তোমায় পুজে॥
ত্রিকাল যে মা থমকে দাঁড়ায়,
রুদ্রানী তোর চণ্ডীরূপে॥
জড়ের বুকে চেতন জাগে'
যুগান্তরের অন্ধকূপে।
হিমগিরির সিংহ তোমার,
বাহন যে গো শক্তি পূজার;
মরণ ভয়ে অসুর কাঁপে, পায়ের তলায় চক্ষু বুঁজে।

BANGL

তন্ত্রপূজায় পঞ্চম কার-

কোন কোন জন্তুর মাংস প্রশস্ত তন্ত্রে তার উল্লেখ রয়েছে। এই সব প্রাণীদের মধ্যে ছাগ, মেষ, সজারু, হরিণ, সারস, হাঁস, বন্যকুক্কুট প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।'নির্বাণতন্ত্র'-এ বলা হয়েছে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন– এই পাঁচটি পঞ্চমকার দিয়ে শক্তি আরাধনা করে থাকেন। অদ্বৈতভাব -কার। সাধকরা এই পঞ্চম-পরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকই পঞ্চতত্ত্বযুক্ত সাধনার অধিকারী। পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে পঞ্চমহাভূতকে দেখানো হয়েছে।

পঞ্চতত্ত্বের তিনটি প্রকারভেদ রয়েছে।

১। প্রত্যক্ষতত্ত্ব ২। অনুকল্পতত্ত্ব ৩। দিব্যতত্ত্ব

১ প্রত্যক্ষতত্ত্বে মদ প্রসঙ্গে - প্রত্যক্ষতত্ত্ব .'পরশুরামকল্পসূত্র'-এ তাল খেজুর প্রভৃতি গাছের রস থেকে উৎপন্ন বা গাছের ছাল বা ফুল থেকে তৈরি মদের কথা বলা হয়েছে।

২পাত্রে নারকেলের জল বা তামার পাত্রে দুধ অনুকল্পতত্ত্বের ব্যাখ্যায় মদ প্রসঙ্গে কাঁসার - অনুকল্পতত্ত্ব . প্রভৃতি বলা হয়েছে।

৩ দিব্যতন্ত্রের ব্যাখ্যায় মদ প্রসঙ্গে .'ভৈরব যামল'-এ বলা হয়েছে, ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রারপদ্মস্থ চন্দ্রকলা থেকে বিগলিত অমৃতধারাই সাধকের পেয়সুধা।

কোন কোন জন্তুর মাংস প্রশস্ত তন্ত্রে তার উল্লেখ রয়েছে। এই সব প্রাণীদের মধ্যে ছাগ, মেষ, সজারু, হরিণ, সারস, হাঁস, বন্যকুক্কুট প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

তন্ত্রমতে, শাল, বোয়াল ও রোহিত– এই তিন রকমের মাছ উত্তম। কাঁটাশূন্য তৈলাক্ত মাছ মধ্যম ও মৎস্যক্ষুদ্র হলে অধম।

তন্ত্র মতে, যা চর্বণীয় তাই মুদ্রা। যেমন ছোলা বা মাষকলাই দিয়ে তৈরি ঘি অথবা তেলে ভাজা দ্রব্য মুদ্রা।

আর যুগলের সংযোগে মৈথুন। সাধনার অঙ্গীভূত মুখ্য মৈথুন শিবস্বরূপ সাধকের সঙ্গে শিবস্বরূপিনী সাধিকার সংযোগ।

অনুকল্পতত্ত্বের ব্যাখ্যায় 'ডামরতন্ত্র' মতে, মাংসের অনুকল্প পিঠে। কৌলাবনী নির্ণয় অনুসারে- মহিষদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ এবং ফলমূল দগ্ধ হলেই আমিষ হয়ে যায়। নৈবেদ্যই মুদ্রা। আর মৈথুন প্রসঙ্গে 'যোগিনীতন্ত্র' বলা হয়েছে, রক্তকরবী লিঙ্গপুষ্প এবং কৃষ্ণ অপরাজিতা যোনিপুষ্প। এই উভয়ের সংযোগ পঞ্চমতত্ত্বের অনুকল্প।

দিব্যতত্ত্বের ব্যাখ্যায় মাংস প্রসঙ্গে 'কুলার্ণবতন্ত্র'-এ বলা হয়েছে– জ্ঞান খড়্গের দ্বারা পূণ্যাপুণ্য রূপ পশুকে বধ করে পরশিবে চিত্ত লয় করার নাম 'মাংস'। 'মৎস্য' প্রসঙ্গে 'আগমসার'-এ বলা হয়েছে– গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে দু'টি মৎস্য সর্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছে। যিনি মৎস্য দু'টি ভক্ষণ করতে পারেন তিনি মৎস্য সাধক। গঙ্গা ও যমুনা হচ্ছে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী। মাছদু'টি ইড়া ও পিঙ্গলাতে প্রবাহিত নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস। যিনি কুম্ভক করে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করতে পারেন, অর্থাৎ এইভাবে মনস্থির করতে পারেন, তিনি মৎস্যসাধক। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগকে 'মুদ্রা' বলা হয়। আর সাধক দেহে শিবশক্তি মিলনই মৈথুন।-

পঞ্চতত্ত্ব সাধনা অদ্বৈতভাবের সাধনা। একমাত্র গুরুর কাছেই এই সাধনার ক্রিয়াকলাপ শিখতে হয়।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মা কালীঃ

কালীকে যদি, বলি কল্পনা তবে সেই কল্পনাও ধর্মে বর্ণিত হয়েছে বর্তমান বিজ্ঞানের ধারণার হাজার হাজার বছর আগে।

এ কথা বিজ্ঞান প্রথমতঃ স্বীকার করে যে, সৃষ্টির আদি যুগে অনন্ত ব্রহ্মাছিল নিকষ কালো অন্ধকারে - নিমজ্জিত, নিশ্চিদ্র তমসায় আবৃত, অনন্ত সৃষ্টিতে তখনো আলোর সৃষ্টি হয়নি। রবি শশী তারা বা কোন আলোকবর্তিকা তখনো ছিলনা। বিজ্ঞান মতে আলোর সৃষ্টির আগে অন্ধকার ছিল। এ বর্ণনায় কান পেতে শুনলে আমরা দেখি কৃষ্ণবর্ণা মা কালী সেই যুগের প্রতিনিধিত্ব করছেন। ধর্ম ও বিজ্ঞানের এখানে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানের 'বিগ্ ব্যাংগ্ তত্ত্ব' মতে কাল বা সময় তখন সবে মাত্র সৃষ্টি হয়েছে, কাল্ বা সময় যখন সৃষ্টি হলো তথা যে দিন ভূমিষ্ঠ হলো, সেদিন নির্ধারিত হলো সেই কালেরও শেষ আছে, সংহার আছে। বিশ্ব ব্রহ্মাসৃষ্টি যখন হয়েছে সময় এলে তা ধ্বংসও হবে। তার লয়ও অবশ্যম্ভাবী। কালী এই সংহারের প্রতিভূ -, তিনি কাল এর জীবন্তকালের সীমারেখার নির্ধারণকৃত।

তৃতীয়তঃ বিজ্ঞানীরা সৃষ্টির প্রথম যুগের মহাবিশ্বের যে বর্ণনা দেন তা ভয়াল ভীষণ তার মধ্যে সৃষ্টির চাইতে ধ্বংসই বেশী। প্রবল সংহারের মধ্যে দিয়ে অনন্ত ব্রহ্মাের সৃষ্টি। মা কালী সেই সংহারের প্রতিভূ তিনি ভয়াল - দর্শনা সংহারের দেবী। সৃষ্টির সেই ক্রমবিকাশের যুগেই মা কালী মা জগজ্জননী প্রবল সংহারের মধ্যে দিয়েই তাঁর সৃষ্টি ও তাঁর কল্যাণময় রূপকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। মা কালী যুগপৎ কাল, কৃষ্ণবর্ণ এবং সংহারের দেবী। কিছুই ছিল না, তখন দেবী ছিলেন। এই মাতৃপূজা মাতৃমূর্তি হিন্দুধর্মের আদিকথা।

ত্বয়ৈতৎ ধার্য্যতে সর্বং
ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ

স্বর্গমহাশক্তি মর্তের এই-, আধ্যাশক্তি মহামায়া, জগজ্জননীমা দুর্গা যেন মমতাময়ী মায়ের মতোই। সকল - সৃষ্টি ও সন্তানই তাঁর চোখে সমান।

ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে আদ্যাশক্তির যে সকল গুণ বর্ণনা করা হয়েছে তার সবই পরম সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের গুণ- ।(৮।১২৫।১০।১০-দেবীসুক্ত-ঋক্) "বাত ইব প্রবামাযারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা" যথা

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে চণ্ডিকা দেবীকে নিত্যৈব সা জগন্মুর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্"; (চণ্ডী৬৪।১-,৭৫(; "ত্বয়ৈতৎ ধার্য্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎইত্যাদি ভাষায় বর্ণন "া করা হয়েছে অর্থাৎ আদ্যাশক্তি মহামায়া সর্বব্যাপিনী এবং সৃষ্টি(৩৪।৫চণ্ডী) য়ের শক্তিরূপিণীপ্রল-স্থিতি-।

প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর যে শক্তি বা প্রকৃতির সহায়তায় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, সেই শক্তিকেই হিন্দুরা মহামায়ারূপে পূজা করেন। দুর্গা, কালী, চণ্ডিকা, যে নামেই ব্যবহৃত হোক না কেন, বিভিন্ন নামে এবং রূপে সেই ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মরূপা মহামায়ারই পূজা করা হয়। ঈশ্বরের শক্তি বহুমুখী, সে জন্যেই ভিন্ন ভিন্ন শক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে

উপাসনা করা হয়। এর মধ্যে যে রূপটি সাধকের প্রচলিত সংস্কার, ধারণা ও রুচি অনুসারে গ্রহণীয় হয়, তিনিই সেই মূর্তিকে ইষ্ট বা উপাস্য বলে বরণ করেন। এজন্যেই হিন্দু ধর্মে বহু দেবদেবী-; বহুরূপে একেশ্বরবাদ। কিন্তু তাদের পট ভূমিকায় আছে সেই অবয়বে "মৃন্ময়ী" আর মূর্তি পূজার সার্থকতা হলো ।"একমেবাদ্বিতীয়ম্" মাটির চেয়ে নেইতো কিছু খাঁটি।-র আরাধনা। সাধারণ কথা বলা হয়"চিন্ময়ী"ভক্তিমার্গীগণ বিশ্বাস করেন যে, অনন্তশক্তি ঈশ্বরের পক্ষে যে কোন রূপই অবলম্বন করা সম্ভব। সুতরাং যে রূপে তাঁকে ঐকানিত্মকভাবে ধ্যান করা যায়, সিদ্ধিলাভের উপযুক্ত হলেসেয়ং শক্তির্মহামায়া "-ঈশ্বর সে রূপেই তাঁকে দর্শন দেন- সচ্চিদানন্দরূপিণী। রূপং বিভর্ত্যরূপা চ ভক্তানুগ্রহহেতবে ॥[৮।৫দেবী ভাগবত] "। তাই মহাসাধকগণ তাঁদের স্ব স্ব ইষ্ট মূর্তিতেই সিদ্ধিলাভ করেন। আদ্যাশক্তি মহামায়া বহুরূপে বিরাজিত। তিনি অনন্ত অসীম, প্রেমময়।

শেষ করি গোস্বামী তুলসীদাসজী তাঁর বিনয় পত্রিকায় : ভাষায় লিখেছেন যে পার্বতী স্তুতি সেটা দিয়ে "অবধি"

BANGL

জয় জয় জগজননী দেবী, সুর-নর-মুনি-অসুর সেবি,
ভুক্তি-মুক্তি-দায়িনী, ভয় হারিণী কালিকা।

মঙ্গল-মুদ-সিদ্ধ-সদনি, পর্ব শর্বরিশ-বদনি,
তাপ-তিমির-তরুণ-তরনি-কিরণ-পালিকা।

বর্ম-চর্ম-কর-কৃপাণ, শূল-শেল-ধনুষ-বাণ,
ধরণী দলনী দানব দল রণ করালিকা।

পুতনা-পিশাচ-প্রেত-ডাকিনি-শাকিনি সমেত,
ভূত-গ্রহ-বেতাল-খগ-মৃগাল-জালিকা।

জয় মহেশ-ভামিনী, অনেক রূপ নামিনী,
সমস্ত লোক স্বামীনী, হিম-শৈল বালিকা।
রঘুপতি-পদ-পরম প্রেম, ‘তুলসী’ য়েহ অচল নেম,
দেহু হৈ প্রসন্ন পাহি প্রণত-পালিকা।
॥জয় দুর্গে দুর্গতিপরিহারিণী মা॥

॥সমাপ্ত॥